NAVALATICA.

A NOVEL.

নবলতিকা।

[উপন্যাস]

বঙ্গাব্দঃ, ১২৮[illegible] ।

কলিকাতা

১৭ নং ভবানীচরণ দত্তের লেন,

রায় যন্ত্রে,

শ্রীবিপিনবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত

ও

১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, রায় প্রেস ডিপজিটরীতে

প্রকাশিত ।

উৎসর্গ।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত অগ্রজ মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু।

দাদা,

আপনার স্নেহবারি সিঞ্চনে পরিবৰ্দ্ধিত বৃক্ষ-বাটীকার একটী বৃক্ষের এই প্রথম প্রসূন। এ প্রসূন মনোমদ সৌগন্ধ্যযুক্ত নহে; ইহাতে রসনার সুতৃপ্তিজনক আস্বাদনও নাই; বস্তুতঃ যে যে গুণ থাকিলে ইহা জনমাত্রের আদরণীয় হইতে পারে এবম্বিধ কোন গুণ ইহাতে দৃষ্ট হয় না। তথাপি আশা হই-তেছে, স্বকীয় শ্রমব্যয়ে ও বহু যত্নে পরিবৰ্দ্ধিত বৃক্ষকের প্রথম প্রসূন বলিয়া ইহা আপনার নিকট অনাদৃত হইবে না। অদ্য আপনার শ্রীচরণকমলে এই পুস্তিকা খানা উৎসর্গ করিলাম। ইহা আপনার শ্রীচরণে স্থান পাইলে সমস্ত পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব। ইত্যলম্ বাহুল্যেন।

কলিকাতা,
বঙ্গাব্দঃ ১২৮৮।

সেবক,
গ্রন্থকারস্য।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গীয় সাহিত্য উপন্যাসমালায় উপপ্লুত হইয়াছে। কেহ কেহ প্রণয়ী-প্রণয়িনীর যুগলমূর্ত্তি ও তাঁহাদিগের স্বর্গীয় প্রেম আঁকিয়া চিরস্মরণীয় হইতে চেষ্টা করিতেছেন, কেহবা যুদ্ধের ঝম্ ঝমা, বীরপুরুষের হুহুঙ্কার ও মানব বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন; আবার কোন কোন গ্রন্থকার প্রেমের তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া প্রেমের লহরি খেলাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থেরই ধর্ম্মের সহিত অল্পমাত্র সংস্রব। আমি এতদ্দ্বারা বলিতেছি না যে আমার এ পুস্তিকাখানা সর্ব্বথা দোষশূন্য; ইহাতেও ভূরি ভূরি দোষ লক্ষিত হইবে। তবে এ পর্য্যন্ত বলিলে বোধ হয় পাঠক মহোদয়গণের নিকট উপহাসাস্পদ হইবনা যে এ পুস্তক পাঠে যদি কাহারও স্বভাব কুপথে নীত হয় তাহাহইলে আমি তাহার অথবা তাহার অভি-ভাবকের নিকট দায়ী রহিলাম। এ গ্রন্থে কোনও পুস্তকের অংশবিশেষের ভাব অনুকরণ করা হয় নাই। যদি ইহার ভাষার দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্যের অবমাননা করা হইয়া থাকে তাহা হইলে আমি অবনতমস্তকে সাহিত্যজ্ঞ মহোদয়গণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব।

গ্রন্থকারস্য।

দ্রষ্টব্য।

এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে এমন অনেক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা স্থূল দৃষ্টিতে অনেকের নিকট দূষণাবহ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে ; যেমন :—"বাতাসের ছোলা আসিয়া শরীরে বাঝিতে লাগিল" "মাথা নোঙইয়া ভাবিতেছি-লেন" 'কাষ্ঠখণ্ড বিছাইতে লাগিল' ইত্যাদি। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিলে ভাষায় এই সকল শব্দের স্থান প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশের যে কোন স্থানে যে কোনও শব্দ যে কোনও ভাব প্রকাশার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে তৎসমুদয়ই গ্রন্থে বিনিবেশিত করা উচিত এবং আবশ্যক। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভাষার সামান্য ইতর বৈষম্যের জন্য বঙ্গদেশবাসি-গণের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত রাখা কোনও ক্রমেই বিধেয় নহে এবং আমরা ভরসা করি এই সাধু সংকল্প কার্য্যে পরিণত করায় কেহই আমাদিগের প্রতি কোনওরূপ বিরাগ প্রদর্শন করিবেন না।

নবলতিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শিবগঞ্জের উত্তর-পূর্ব্বে বিলাসপুর নামে এক গ্রাম আছে। বিলাসপুর সুবর্ণ-প্রভার তীরে অবস্থিত। বিলাসপুর এক খানা ছোট গ্রাম, এই গ্রামে প্রসিদ্ধ ধনবান্ অথবা জমিদারের সংখ্যা অল্প। গ্রামস্থ অধিকাংশ লোক ভদ্রবংশ-সম্ভূত। নদীতটে কয়েক খানা ভদ্রলোকের বাটী ছিল;তন্মধ্যে রামগোপাল বিদ্যা-রত্নের বাটী অন্যান্য বাটী অপেক্ষা একটু উচ্চ দরের। রামগোপা-লের দুইটী পুত্রসন্তান ছিল। যদিও তিনি নিজে সংস্কৃত টোলে অধ্যয়ন করিয়া থাকুন তথাপি তিনি ন্যায়-শাস্ত্র তর্ক-শাস্ত্র লইয়া সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন না। তাঁহার বুদ্ধি-শক্তি নিতান্ত প্রখর ছিল। তিনি ছোট বেলা হইতেই অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন ও অনেক স্থানে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। পাঠ সমাপ্তির পর রামগোপাল অন্যান্য টোলীয় পণ্ডিতের ন্যায় শ্রা-দ্ধাদি উপলক্ষে ধনীদিগের দ্বারে দ্বারে না ফিরিয়া কোন একটী প্রসিদ্ধ জমিদারের সরকারে নায়েবীতে নিযুক্ত হন এবং কয়েক বছরের মধ্যে বহুল অর্থ সঞ্চয় করেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে রামগোপা-লের বয়ঃক্রম ছাপ্পান্ন বছর ছিল। তিনি শারীরিক অসুস্থতা

নিবন্ধন কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রামগোপালের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শশিভূষণ। রামগোপাল পুত্রদিগকে উপযুক্ত রূপ শিক্ষা প্রদানে কৃত-সঙ্কল্প ছিলেন, তিনি ছোট সময়েই শশিভূষণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন। শশিভূষণ পিতার উদ্যোগে ও শিক্ষকের যত্নে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক দূর শিখিয়া ফেলেন। বাটীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কোনও বড় বিদ্যালয় ছিল না; শশিভূষণ অপেক্ষাকৃত উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবার নিমিত্ত পিতার আদেশে বাটী ত্যাগ করিয়া সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে মুরশিদাবাদে উপস্থিত হন। তথায় সাত বছর অধ্যয়ন করিয়া প্রচুর বিদ্যালাভ করেন। শশিভূষণ বুঝিয়াছিলেন বিদ্যার শেষ নাই; যতই শিক্ষা করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহ হইতে লাগিল; তিনি আরও শিক্ষা করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না; শশিভূষণের ছাব্বিশ বছর বয়সে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল, আপাততঃ লেখা পড়া ত্যাগ করিয়া শশিভূষণ বাটী আসিলেন।

শশিভূষণ নিতান্ত পিতৃবৎসল ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার মন সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিত। তিনি কাহারও সহিত হাস্যালাপ করিতেন না; সর্ব্বদা গম্ভীর ভাবে বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেন। পিতা যে ধন সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহাদের সাংসারিক ব্যাপার সুন্দররূপে চলিতে লাগিল। শশিভূষণের ক্ষণকালের জন্যও পরিবার প্রতিপালনের কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। তাঁহার কনিষ্ঠের নাম বিধুভূষণ। পিতার অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পরেই বিধুভূষণ পিতার পৌরাণিক কার্য্যে নিযুক্ত হন। সাংসারিক সমস্ত ভার বিধুভূষণের উপর ন্যস্ত ছিল, শশিভূষণের কোন বিষয়েরই পর্য্য-

বেক্ষণ করিতে হইত না; অথচ তিনি সর্ব্বদা বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতেন, কি চিন্তা করিতেন, তিনিই বলিতে পারেন।

যত দিন বিধুভূষণ বাটী ছিলেন তত দিন পর্য্যন্ত শশিভূষণ অপেক্ষাকৃত সুস্থমনা ছিলেন; বিধুভূষণ কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলে পর তাঁহার মানসিক অস্থিরতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শশিভূষণের অবস্থা দর্শনে পরিবারস্থ সকলেই ম্রিয়মাণ থাকিতেন; তাঁহারা কোন সময়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কোন প্রত্যুত্তর করিতেন না; তাঁহারাও বারংবার শশিভূষণকে বিরক্ত করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিতেন না।

এই রূপে দিন চলিতে লাগিল। সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত পার্থিব সমস্ত বিষয়েরই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন হয়; যে আজ পুত্রশোকে কাতরা হইয়া ধরায় বিলুণ্ঠিত হইতেছে, সময়ে দেখিবে সে পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া নিশ্চিন্তমনে সমবয়স্কগণের সহিত হাস্যালাপে প্রবৃত্ত হইতেছে। পৃথিবীতে যাহার সুখসম্ভোগের কোন আশা নাই, যে সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, আজ বন হইতে বনান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কাল দেখিবে তাহার অবস্থার কত দূর পরিবর্ত্তন। পৃথিবীর এই নিয়ম; আজ যে হাসিতেছে কাল সে কাঁদিতেছে, আজ যে ভাবিতেছে, কাল সে খেলিতেছে। প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের মানসিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, অথচ আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত শশিভূষণের মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার এ পরিবর্ত্তন শোচনীয়। যদি তাঁহার মানসিক বৃত্তি সকল সময়ে সমান ভাবে ক্রীড়া করিত তাহা হইলে তিনি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্তমনে থাকিতে পারিতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"সাগর উদ্দেশে নদী, ফিরে দেশে দেশেরে
অবিরাম গতি।
গগনে উদিলে শশি, হাসি যেন পড়ে খসি
নিশি রূপবতী।"

যামিনী দ্বিতীয় প্রহর। পাখীগণ নিজ নিজ কুলায়ে পাখা গুটাইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। আর তাহাদের সেই শ্রুতি-সুখকর মধুরধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে না, আর তাহারা শাখা হইতে শাখান্তরে উড়িয়া পড়িয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে না। বিশ্রামের এই প্রশস্ত সময়। জীবগণ দিবসিক ব্যাপারে ক্লান্ত হইয়া সম্প্রতি নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিতেছে এবং সকলেই নিজ নিজ রোগ শোক পরিতাপাদি বিস্মৃত হইয়া ক্ষণ কালের জন্য নিশ্চিন্ত মনে শারীরিক শ্রম বিনোদন করিতেছে। পৃথিবী নিস্তব্ধ। রাত্রিচরগণের কর্কশস্বর ও সময়ে সময়ে শুষ্ক-পত্রোপরি তাহাদিগের মর্ম্মরায়মান পাদক্ষেপণ-শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শ্রবণ-গোচর হইতেছে না।

এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষে একখানা নৌকা দেখা দিল। নৌকা-খানা মন্দ মন্দ গমনে হেলিয়া দুলিয়া নদীর জলে গা ভাসাইয়া চলিতে লাগিল। নদীর জল নির্ম্মল, নীলাকাশে শোভমান নক্ষত্রসমূহের প্রতিবিম্ব তাহাতে প্রতিফলিত হইতেছিল। আহা! এ দৃশ্য কি সুন্দর! যে একবার চন্দ্রালোকে জল-পথে গমন করিয়া এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সেই বলিতে পারে, ইহার মনোহারিত্ব-গুণ কি রূপ। নৌকাখানা ধীরে ধীরে চলিতে

আরোহীগণ সকলেই নিদ্রিত, কেবলমাত্র মাঝী পিছনের দিকে হাইল ধরিয়া ছাপ্পরের উপর নিশ্চিন্তমনে বসিয়া আছে ও মাঝে মাঝে "সাধুরে ভাই" বলিয়া নিজ মনে গান টানিতেছে। সময় যাইতেছে, রহিতেছে না; সুখের সময় দুঃখের সময়, সকল সময়ই সমভাবে অবিশ্রান্ত চলিতেছে। মাঝী চন্দ্রালোকে বসিয়া মনের আনন্দে গান গাইতেছিল এবং সময়ে সময়ে আ-কাশ পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নক্ষত্রমণ্ডল দেখিয়া আনন্দে ভাসিতেছিল, তাহার এ সময় রহিল না; অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল। সকল সময় সমান ভাবে যায় না; কোনও সময় সুখে, কোনও সময় দুঃখে অতিবাহিত হয়। মাঝীর সুখের সময় অতিবাহিত হইতে চলিল।

রাত্রি আড়াই প্রহর অতীতপ্রায়। পূর্ব্বাকাশে এক খণ্ড নূতন মেঘ সাজ্জিয়াছে। মেঘ খণ্ড ক্রমে ক্রমে বৃহদাকার ধারণ করিতে লাগিল, চন্দ্রের কিরণজাল ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল; ক্ষণপ্রভা সময়ে সময়ে রহিয়া রহিয়া চমকিতে লাগিল; কিন্তু মাঝীর এ দিকে দৃষ্টি নাই; সে এখনও গানে মত্ত। আপন মনে আপনি গাইতেছে, আপনি শুনিতেছে, আপনি মাথা নাড়ি-তেছে। নৌকাখানা ক্রমে ক্রমে বাহির নদীতে আসিয়া পড়িল, বায়ুর বেগ ক্রমশঃ বাড়িতেছে, দুই এক ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়ি-তেছে, তথাপি মাঝীর চৈতন্য নাই। হটাৎ মেঘ গর্জ্জনে মাঝীর ধ্যান ভঙ্গ হইল; মাঝী চমকিয়া উঠিল, আকাশ পানে চাহিয়া দেখিতে পাইল সে নক্ষত্র নাই, সে চন্দ্রমা নাই, সে নীলবর্ণ আকাশাও নাই। বায়ুর বেগ বাড়িতে লাগিল, নৌকারোহীরা ক্রমে ক্রমে সকলেই জাগিয়া উঠিল। মাল্লাগণ প্রাণপণে ক্ষেপণি ক্ষেপণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া নৌকার উপর পড়িতে লাগিল;

অবশেষে একটী ছোলা আসিয়া নৌকাখানা একেবারে উল্‌টিয়া ফেলিল; নৌকা ডুবিয়া গেল।

আরোহীগণের মধ্যে একটী বলিষ্ঠ যুবক ছিল, তাঁহার নাম বিধুভুষণ। এ আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত বিধুভুষণ, শশিভুষণের কনিষ্ঠ। বিধুভুষণ ও তাঁহার এক বন্ধু উভয়ে কর্ম্মস্থান হইতে সপরিবারে বাড়ী আসিতেছিলেন। নৌকা ডুবির পর বিধুভুষণ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত স্বকীয় স্ত্রী ও কন্যার অন্বেষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন মতেই তাঁগাদের কোন উদ্দেশ পাইলেন না; অবশেষে হতাশ হইয়া অগত্যা নিজের জীবনের জন্য তীরের দিকে ছুটিলেন ও বহু আয়াসের পর নদীর কিনারায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আর্দ্রবসনে বিধুভুষণ তীরে উঠিলেন। এখনও বৃষ্টি পড়িতেছে, মেঘ ডাকিতেছে, আকাশ এখনও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বিধুভুষণের অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছিল, তীরে উঠিয়াই বসিয়া পড়িলেন। বৃষ্টির জল তাঁহার গা ধৌত করিতে লাগিল, উপর্য্যুপরি বাতাসের ছোলা আসিয়া শরীরে বাঝিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার সে জ্ঞান নাই; তাঁহার মনে যে ঝঞ্ঝা বহিতেছিল বাহিরের ঝঞ্ঝা তাহার নিকট পরাভব মানিল, তাঁহার অন্তরে যে অগ্নি জ্বলিতেছিল, বাহিরের বাতাসে তাহা নির্ব্বাণ করিতে পারিল না। বিধুভুষণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন, আজ তাঁহার এক নুতন সময়, আজ তাহার এক নুতন ভাব। তিনি কোনও সময়ে এইরূপ কষ্টে পড়েন নাই, কোনও সময়ে এইরূপ ভাবনায় পড়েন নাই, কোনও সময়ে তাঁহাকে শোকের এইরূপ দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিতে হয় নাই। আজ তিনি নূতন কষ্টে পড়িয়াছেন, আজ তিনি নুতন ভাবনায় পড়িয়াছেন, আজ তিনি অননুভুতপূর্ব্ব শোক-সাগরে গা ডুবাইয়া হাবুডুবু খাইতেছেন ও অশ্রুজলে বুক ভাসাইতেছেন।

ক্রমে বৃষ্টি থামিল, বায়ুর বেগ মন্দ হইতে লাগিল, আকাশে নক্ষত্রগণ একে একে দেখাদিতে লাগিল। বিধুভূষণ এতক্ষণ মাথা নোওাইয়া ভাবিতেছিলেন, এখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন; চারিদিকে চাহিলেন কিছুই দেখিতে পাইলেন না, আবার বসিয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে পুনরায় উঠিলেন, নদীর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, দেখিলেন কি যেন ভাসিতেছে, ডুবিতেছে, তরঙ্গে খেলিতেছে। বিধুভূষণের সহ্য হইল না, তিনি নদীরজলে লম্ফপ্রদান করিয়া লক্ষ্য উদ্দেশ্যে সাঁতরাইতে লাগিলেন; যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন কিছুই নাই। ক্ষণকাল আশে পাশে সাঁতরাইলেন, দেখিলেন কিছুই নাই; অবশেষে ডুবের উপর ডুব দিতে লাগিলেন, তথাপি কিছু পাইলেন না। নদীতে ছোট ছোট তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহাতে চন্দ্ররশ্মি পতিত হইয়া খেলিতেছিল, অজ্ঞান বিধুভূষণ তাহাই দেখিয়া জলে সাঁতার দিয়াছিলেন; অধুনা আশায় দ্বিগুণ নিরাশ হইয়া জীবন বিসর্জ্জনে কৃতসংকল্প হইলেন এবং তদভিপ্রায়ে হস্ত পদের গতিরোধ করিয়া জলে ডুবিলেন, কিন্তু অধিক সময় ডুবিয়া থাকিতে পারিলেন না, ক্ষণকাল পরেই পুনরায় ভাসিয়া উঠিলেন; মরিতে কাহার ইচ্ছা! বিধুভূষণ মরিতে পারিলেন না, অতি কষ্টে নদীতটে উপস্থিত হইলেন।

আর রাত্রি নাই; আকাশস্থ নক্ষত্রগুলি ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে; প্রাতঃসমিরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে, পূর্ব্বাকাশ পরিস্কার হইয়া উঠিয়াছে। বিধুভূষণ দেখিলেন প্রভাত হইয়াছে, উঠিয়া আস্তে আস্তে সমীপস্থ গ্রাম অভিমুখে চলিলেন এবং জনৈক ভদ্রলোকের বাটীতে উপস্থিত হইয়া নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। বাটীর কর্ত্তা বিচক্ষণ ভদ্রলোক, নাম রামগোপাল গোস্বামী। তিনি তাঁহার প্রমুখাৎ সমস্ত সংবাদ যথাবৎ অবগত

হইয়া নিতান্ত আর্দ্রচিত্ত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে ভৃত্যবর্গকে তাঁহার যথোচিত সুশ্রুষা করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি বিধুভূষণকে বলিলেন"তুমি যদি দিন চারি পাঁচ আমার বাটীতে অপেক্ষা কর তাহা হইলে বোধ হয় আমি তাহাদের একটা সংবাদ আনিয়া দিতে পারিব।" বিধুভূষণ অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলেন; তিনি ঐ স্থানে অনেক দিন রহিলেন; এবং রামগোপালের যত্নে চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইয়া স্ত্রী ও কন্যার অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু কোন সংবাদ পাইলেন না। কেবল মাত্র একটী লোক বলিয়াছিল "আমি একটী আর্দ্র-বসনা পাগলিনীকে নদীতটে বসিয়া বসিয়া হাসিতে দেখিয়া-ছিলাম, কিন্তু সে এখন সেই স্থানে নাই, কোথায় গিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না।" বিধুভূষণ আরও দিন চারি অপেক্ষা করি-লেন, কোনও সংবাদ পাইলেন না। অবশেষে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া তাহাদিগের অন্বেষণে স্থানান্তরে বহির্গত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"সুত পরিবার
কেবা বল কার
যেমন বৃক্ষের ছায়া।
জলবিম্ব প্রায়
সর্ব্বমিছামর
কেবল ভবের মায়া।

দিবা অবসানপ্রায়। রাখালেরা মাঠ হইতে গরু সঙ্গে করিয়া বাটী অভিমুখে চলিতেছে; গরুগুলি মাঠ ফেলিয়া বাড়ী যাইতে চাহিতেছে না; এ দিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া আহারীয় যাহা সম্মুখে পাইতেছে, তাহাই ধরিয়া গিলিতেছে। গরুর পেটে

এখনও ক্ষুধা, সারাদিন খাইয়াও পেট ভরে নাই। রাখাল তাহাদের পেটের জ্বালা বুঝিতেছে না, কেবলই উৎপীড়ন করিতেছে, তথাপি গরু যাইবে না। রাখাল গরুগুলিকে প্রহার কিরতে আরম্ভ করিল, গরুর বড় সহিষ্ণুতা, তাহারা অবনত মস্তকে উৎপীড়ন সহ্য করিতে করিতে বাটী অভিমুখে চলিল। কিন্তু একটী গরু যাইবেনা, রাখাল তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল, গরুও আর সহ্য করিতে না পারিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য রাখালের দিকে ছুটিল। রাখাল ভয় পাইয়া সরিয়া গেল।

নদীতটে বসিয়া একটী যুবা এই সমুদয় দেখিতেছিল। যুবকের সম্মুখে একটী বৃদ্ধ ও একটী ছেলে ম্লান বদনে বসিয়া রহিয়াছিল। যুবার মুখে কালিমা পড়িয়াছে, কেহ দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিত যুবক কোন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। অনতিদূরে একটী মৃতদেহ শয়িত রহিয়াছে। শব-পার্শ্বে একটী দীপ নিবি নিবি জ্বলিতেছে। যতক্ষণ গরুগুলি মাঠে ছিল যুবকের দৃষ্টি তাহাদিগেরই দিকে আকৃষ্ট ছিল; কিন্তু যখন ক্রমে ক্রমে মাঠ শূন্য হইল, যুবক চক্ষু ফিরাইয়া এক দৃষ্টে মৃত দেহ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, যখন দেখিলেন যুবকের দৃষ্টি মৃতদেহে আবদ্ধ রহিয়াছে, তখনই তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ছি! ওদিকে চাইতে নাই, অন্য দিকে তাকাও।" যুবক বসিয়া ভাবিতেছিলেন, বৃদ্ধের কথা শুনিতে পাইলেন না; তাঁহার চক্ষু মৃতদেহের দিকেই রহিল। যুবক গম্ভীর, নিশ্চল, নিস্তব্ধ। বৃদ্ধ পুনরপি কহিলেন "ছি, শশি, ও দিকে তাকা'তে নাই, তুমি কি ছেলে মানুষ?" যুবকের নাম শশিভুষণ; পাঠক! এ আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত শশিভুষণ। আজ শশিভুষণের

মাতার মৃত্যু হইয়াছে। শশিভুষণ শবদাহের নিমিত্ত জনৈক আত্মীয় সহ নদীতটে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা এতক্ষণ যাহাদের অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছিলেন, ক্রমে তাহারা সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল। শবের জন্য চিতা প্রস্তুত হইলে, শব অনতিবিলম্বে যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

যুবক একদৃষ্টে সমুদয় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। দেখিলেন নির্দ্দয় পুরোহিত ও প্রতিবেশীগণ সমবেত হইয়া সজোরে গতজীবনা জননীর হাত পা গুটাইয়া চিতাভ্যন্তরে রাখিল এবং তদুপরি কাষ্ঠখণ্ড বিছাইতে লাগিল। সমস্ত ঠিক হইলে পর বৃদ্ধ শশিভুষণ-সমীপে আসিয়া বলিলেন—"তবে এখন চল।"

শশি। কোথায় যাইব?

বৃদ্ধ। তোমার মাতার মুখাগ্নি করিতে।

যুবক অন্যমনস্ক, কিছুই বুঝিলেন না, বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বৃদ্ধ যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "এই ধর, এই জ্বলন্ত অগ্নি তোমার মাতার মুখে প্রদান করিতে হইবে।" যুবক শিহরিলেন, ভাবিলেন বৃদ্ধ তাঁহাকে গালি দিতেছেন। যুবক কোনদিন মুখাগ্নি করেন নাই; কাহাকে মুখাগ্নি করিতে দেখেনও নাই, সুতরাং ভাবিলেন বৃদ্ধ তাঁহাকে গালি দিতেছেন। বৃদ্ধ পুনরপি কহিলেন "বিলম্ব করিও না।" যুবকের আর সহ্য হইল না, যুবক ক্রোধে, বিষাদে অস্থির হইলেন, বলিলেন "কি! আপনি এজন্যই আমাকে এস্থানে নিয়া আসিয়াছেন।" বৃদ্ধ বলিলেন "এতে কোন দোষ নাই, সকলেরই এইরূপ করিতে হয়, না করিলে পাপ আছে।" যুবক আর দ্বিরুক্তি করিলেন না; বৃদ্ধের বাক্য তাঁহার নিকটবেদবাক্য স্বরূপ। তিনি কম্পিত হস্তে অগ্নি লইয়া চিতা-সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু অগ্নি দিতে

পারিলেন না ; দুইবার চেষ্টা করিলেন, দুইবারই কাষ্ঠখণ্ড হস্ত হইতে অপসৃত হইয়া ভূমিতে পড়িল, তৃতীয় বার বৃদ্ধ তাঁহার হস্তে ধরিয়া যথাস্থানে অগ্নি প্রদান করাইলেন ; অগ্নি ধা ধা করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ধন্যরে ভারতীয় প্রচলিত নিয়ম, ধন্য তোমার প্রভাব ! তোমাকে লঙ্ঘন করে কাহার সাধ্য ? অসীম তোমার ক্ষমতা। ঐ যে ঘরে ঘরে অপ্রাপ্ত-বয়স্কা তরুণ বালিকা বৈধব্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে উহা তোমার প্রভাবে ; ঐ যে প্রতি গ্রামে অবিবাহিতা বর্ষীয়াগণ চির-কুমারী-ব্রত অবলম্বনে বাধ্য হইয়া অপরিসীম যাতনা ভোগ করিতেছে, উহাও তোমার প্রভাবে ; আর আজ যে শশিভূষণ শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে মাতৃমুখে অগ্নি প্রদান করিতেছেন, উহাও তোমারই প্রভাবে। যে মা শিশুকাল হইতে পরম যত্নে লালন পালন করিয়াছেন, যাঁহার প্রসাদে পৃথিবী দর্শন, যাঁহার মুখ দেখিলে অন্তরের সমস্ত দুঃখ শোক অস্তমিত হয়, যাঁহার অদর্শনে মন অবসন্ন, আজ তাঁহারই মুখে অগ্নি প্রদান !! শশিভূষণের আর সহ্য হইল না, তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল ; অর্দ্ধ-অজ্ঞানাবস্থায় শশিভূষণ অনতি দূরে পড়িয়া রহিলেন।

পাঠক, তুমি শশিভূষণকে দুর্ব্বল বলিতে চাও ? আমি তাঁহাকে দুর্ব্বল বলিব না, স্ত্রীজাতি-সুলভ দুর্ব্বলতায় তাঁহাকে আক্রমণ করে নাই ; তবে যে কেন শশিভূষণ আজ মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচয় দিতেছেন, যদি কোন দিন স্বজন-বিরহ ভোগ করিয়া থাক, এবং যদি তোমার মন লৌহগঠিত না হয়, সহজেই বুঝিতে পারিবে।

শবদাহ শেষ হইলে সকলে নিজ নিজ আলয়ে প্রস্থান করিলেন ; বৃদ্ধও শশিভূষণকে তাঁহার বাটীতে রাখিয়া আসিলেন। শশিভূষণের বাটী আজ লোক-সমাগম-শূন্য বোধ হইতেছে ;

আজ আর তাঁহার বাটীর সেই শ্রী নাই, সেই সৌন্দর্য্য নাই ; সমস্ত একবারে লোপ পাইয়াছে। শশিভুষণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাটীও নিঃশব্দে রোদন করিতেছে। আজ শশিভুষণের বাটীর কাহারও নিদ্রা নাই, অথচ সকলেই নিস্তব্ধ, কেহ একটী কথা কহিতেছে না। শশিভূষণের একটী অল্পবয়স্ক ছেলে ছিল, সে ক্ষণে ক্ষণে আঁধারে পিতামহীর জীবন্তমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া চমকিতে লাগিল ; শশিভূষণের স্ত্রী এখনও নিঃশব্দে রোদন করিতেছে। আর শশিভুষণ ! চেয়ে দেখ তাঁহার ভাবের কত দূর পরিবর্ত্তন। একদণ্ড পূর্ব্বে তাঁহার বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে ভাসিতেছিল, এখন দেখিতে পাইবে তাঁহার সেই অশ্রুজল নাই, তাঁহার মুখে সেই কালিমা নাই, তাঁহার আর সেই মানসিক দুর্ব্বলতা নাই।

শশিভুষণ শয়ন করিলেন কিন্তু নিদ্রা আসিল না; তিনি নিদ্রার জন্য কোন চেষ্টাও করিলেন না। নিমীলিত-নয়নে শশিভুষণ ভুত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। নানা প্রকারের নানা চিন্তা উপর্য্যুপরি তাঁহার মনে উপস্থিত হইতে লাগিল ; কিন্তু একটী চিন্তায় তাঁহাকে বড় আকুল করিয়া তুলিল, তিনি আর শয়ন করিতে পারিলেন না। চিন্তাজ্বর বড় বিষম জ্বর, এই জ্বরে আক্রান্ত হইয়া ভাল মানুষ পাগল হয়, সৎ অসৎ হয়, অসৎ সৎ হয়, ভাল মন্দ হয়, মন্দ ভাল হয় পার্থিব রোগ অপেক্ষা এই রোগ সবিশেষ কষ্টদায়ক। ইহারই প্রভাবে নিমাই গৃহ ত্যাগ করেন, ইহারই প্রভাবে বুদ্ধদেব অতুল সুখ-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখভোগে আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করেন ; আর আজ শশিভুষণও ইহারই প্রভাবে শয্যা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

শশিভুষণ শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন ; বাহিরে

আসিয়া ক্ষণকাল নিকটস্থ উদ্যানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভগবান চন্দ্রমার বিমল জ্যোতি উদ্যানকে হাসাইতেছিল, সমীরণ ধীরে ধীরে বহিয়া গাছের পাতা কাঁপাইতেছিল, কিন্তু শশিভূষণ এ সমস্ত কিছুই লক্ষ্য করিলেন না; শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর ধীরে ধীরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অদূরে একটী কীট রহিয়া রহিয়া বিকট শব্দ করিতেছিল,শশিভুষণের কর্ণ সেই দিকে ধাবিত হইল; তিনি শব্দ লক্ষ্য করিয়া কিছুকাল চলিলেন, কিন্তু কীট পাইলেন না; শশিভুষণ বিরক্ত হইয়া নদীতটাভিমুখে চলিলেন। নদীতটে উপস্থিত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে চলিতে চলিতে মাতৃ-শবদাহ-ঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং অন্যত্র না যাইয়া ঐ স্থানেই বসিয়া রহিলেন।

দুঃখ, শোকে শশিভুষণ জর্জ্জরিত হইয়াছেন, এখন আর তাঁহাকে দুঃখশোকের চিন্তায় আকুল করিতে পারে না। পূর্ব্বে যে দৃশ্য তাঁহার নিকট ভয়ঙ্কর বোধ হইত, এখন সে দৃশ্য তাঁহার নয়ন-রঞ্জন হইয়া উঠিয়াছে; পূর্ব্বে যে বিষয় চিন্তা করিতে তিনি কষ্ট বোধ করিতেন, এখন সে বিষয় চিন্তা করিতে তাঁহার সুখ অনুভব হয়; শশিভুষণ এখন একপ্রকার উন্মাদগ্রস্থ। কিন্তু এ উন্মাদ অন্যান্য শ্রেণীর উন্মাদ হইতে অনেক পৃথক্; ইহার উন্মত্ততার সহিত অন্য কাহার উন্মত্ততার সামঞ্জস্য নাই। শশিভুষণ নদীতটে বসিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, চিন্তার বেগ ক্রমে এত বলবৎ হইয়া উঠিল যে শশিভূষণের পক্ষে আর চুপ্ করিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল, তিনি সজোরে নদীতটে পাদক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখ হইতে আপনা আপনি প্রলাপলহরী নির্গত হইতে লাগিল, শশিভুষণ বলিতে লাগিলেন—

"পৃথিবি! কে তুমি? কোন্ স্থান হইতে আসিলে! কো-

থায় তোমার উদ্ভব ? কিছুই জানি না, কে আমায় বলিয়া দিবে! তোমার এই সুবিস্তৃত দেহ কোথায় পাইলে ? তুমি কোন্ কোন্ উ পাদেয়ে নির্ম্মিত ? মৃত্তিকা জলাদি দ্বারা ? মৃত্তিকা কি ? জল কি ? আমি বুঝি না, কে আমায় বুঝাইয়া দিবে ? কেহ কেহ বলে তুমি সূর্য্যমণ্ডলের অংশ স্বরূপ, বিপ্রকর্ষণ দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছ ; সূর্য্যমণ্ডল কাহাকে বলে ? ঐ যে আমরা দেখিতেছি ? সূর্য্য কোথা হইতে আসিল ? কে উহার নির্ম্মাতা ? কিছুই জানি না। ঐ দেখ, একটী গাছ চন্দ্রমার বিশদ কিরণে হেলিতেছে, ঢুলিতেছে, পাতা কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া খেলিতেছে ; চন্দ্রমার কিরণ কি ? চন্দ্র কাহাকে বলে ? আর গাছ ? গাছ কাহাকে বলে ? ঐ যে আমরা দেখিতেছি ? ও কাঁপিতেছে কেন ? পাতা নড়িতেছে কেন ? বায়ু সঞ্চারণে ? বায়ু কাহাকে বলে ? কিছুই বুঝি না, কে বুঝাইয়া দিবে ? ঐ যে আর একটী গাছ রহিয়াছে উহার পাতা নাই কেন ? পাতা ঝরিয়াছে ? ঝরিল কেন ? উহার বর্ণ ওরূপ কেন ? উহার মৃত্যু হইয়াছে ? মৃত্যু কাহাকে বলে ? মরিলে কোথায় যায় ? ঐ যে তখন মা মরিয়া গেলেন,কোথায় গেলেন ? আত্মার মৃত্যু নাই, তবে আত্মা কোথায় যায় ? কে বলিবে ? আমি মানুষ, মানুষ কাহাকে বলে ? আমাকে ? আমি কোথা হইতে আসিয়াছি ? জনক জননী হইতে ? জনক জননী কোথা হইতে আসিয়াছিলেন ? তাঁহাদের জনক জননী হইতে ? মানুষের আদি পুরুষ কোথা হইতে আসিয়াছিলেন ? কে বলিবে, আমি জানি না। মানুষ মরে কেন ? মরিলে ফিরে না কেন ? আমার মা মরিয়াছেন, বাবা মরিয়াছেন, তাঁহারা কি আর ফিরিবেন না ? আর কি তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইব না ?"

শশিভুষণের বাক্ রোধ হইল, আর বলিতে পারিলেন না ;

সমীপস্থ আম্র-বৃক্ষ-তলে বসিয়া পড়িলেন, বসিয়া বসিয়া পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন। সম্মুখে কতক গুলি শুষ্ক আম্রপত্র পড়িয়া রহিয়াছিল, কয়েকটী পাতা হাতে করিয়া লইলেন; একটী পাতা জলে ফেলিয়া দিলেন, পাতাটী ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া গেল, যতক্ষণ দেখা গেল চাহিয়া রহিলেন, যখন চক্ষুর অগোচর হইল, তখন আর একটী পাতা লইলেন; পাতাটী ছিঁড়িয়া জলে ফেলি-লেন, এটীও ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া গেল। শশিভূষণ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন; সেই দীর্ঘ নিশ্বাস সহ অনতিদূরে পশ্চাৎ হইতে কেহ বজ্র-গম্ভীর নিনাদে বলিয়া উঠিল "এই রূপে সকলই চলিয়া যাইবে।" শশিভূষণ চমকিলেন, পশ্চাতে ফিরিয়া দেখেন জীর্ণবসনা জনৈক স্ত্রীলোক অদূরে দাঁড়াইয়া আছে; দেখিয়াই দাঁড়াইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি ?"

স্ত্রীলোক। জল দেখিতে যাব আমি গঙ্গা-উপকূলে, হি-হি-হি !!!

শশিভূষণ বুঝিতে পারিলেন এ উন্মাদগ্রস্থা, কিন্তু উন্মাদ-গ্রস্থা হইলে তাহার মুখ হইতে ঐরূপ সারগর্ভ বাণী কি প্রকারে বাহির হইল ? শশিভূষণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কাহাকেই দেখিতে পাইলেন না, ক্ষণকাল পরে পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি ?"

স্ত্রীলোক। স্বর্ণ হার ছিঁড়ি মোর পড়ে গেল জলে, হি-হি-হি!!!

শশি। তোমার হার হারাইলে, কবে ?

স্ত্রীলোক। কে তুমি আমার, অন্তরাত্মাকে জ্বালাইতেছ ? আমি তোমার কথা শুনিব না; হি-হি-হি !!!

শশিভূষণ দেখিলেন এ এক নূতন রকমের পাগল, পুনরপি জিজ্ঞাসিলেন—"তোমার নাম কি ?"

স্ত্রীলোক। আমার নাম পাগ্‌লী, তোর নাম কি ?

শশি। আমার নাম শশি।

স্ত্রীলোক। আমি একটী শ্লোক জানি, শুন্‌বি?

শশি। শুন্‌ব।

স্ত্রীলোক। অনুবেল মেঘ আসি আবরয়ে শশি। হি-হি-হি!!! পাগলিনী ছুটিল, শশিভূষণও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল, সেই হইতে বিলাসপুরে আর শশিভূষণকে কেহ দেখিতে পাইল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"মা কুরু ধন জন-সম্পদ-গর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কাল সর্ব্বং।"

ভোর হইল, পাখীগুলি কোটর হইতে কিচি কিচি ধ্বনি করিতে করিতে একটী একটী করিয়া বাহিরে আসিয়া গন্তব্য পথাভিমুখে চলিতে লাগিল। ইহারা মানুষ হইতেও উদ্যোগী, মানুষেরা এখনও পড়িয়া ঘুমাইতেছে, এখনও অধিকাংশ মনুষ্যের চৈতন্য হয় নাই; কিন্তু ইহারা ভোর হওয়া মাত্রেই স্বকীয় কার্য্য সাধনাভিলাষে উড়িয়া ফিরিতেছে। আলস্যে ইহারা সময় কাটায় না; যখন নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন মাত্র ঘন পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া সুশীতল সমীরণে শরীর জুড়ায়। কিন্তু বিশ্রামের সময়েও ইহারা মনের আনন্দে কূজন করিতে করিতে জীবমাত্রেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে। আর তুমি? তুমি কি করিতেছ? তুমি কি প্রতিদিন প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বকীয় কার্য্য-সাধনে উদ্যোগী হইতেছ? কখনই নয়। সময়ে সময়ে তুমি 'উদ্যোগী পুরুষঃ সিংহঃ' হইয়া দাঁড়াও বটে, কিন্তু পুনরায় সময় বিশেষে শয্যার সহিত তোমার অকারণে

এতদূর মিত্রতা হইয়া উঠে যে তাহার অনুরোধ লঙ্ঘন করিয়া অন্যত্র গমন করা আর তোমার সাধ্যায়ত্ত হয় না।

পূর্ব্বদিক্ লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতে লাগিলেন। বড় বড় গাছের উপরে সূর্য্য-রশ্মি পতিত হওয়াতে পাতাগুলি ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। প্রাতঃ-সুলভ সমীরণ পুষ্পের ঘ্রাণ বহন করতঃ মৃদুমন্দ-সঞ্চারণে গাছের পাতা দোলাইতে লাগিল। সকলেই শয্যা-ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু শশিভূষণের বাড়ীর লোক এখনও নিদ্রিত কেন? অথবা এ প্রশ্ন অনাবশ্যক। যাহারা প্রায় সারারাত্রি কাঁদিয়া কাটাইয়াছে, এ নিদ্রা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। শশিভূষণের স্ত্রীর নাম নির্ম্মলা; নির্ম্মলা এখনও ঘুমাইতেছেন, ইহ জন্মের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ঘুমাইতেছেন, জানেন না যে তাঁহার সুখ-সূর্য্য চিরদিনের তরে অস্তমিত হইয়াছে। নিদ্রিতাবস্থায়ও নির্ম্মলার মনে শান্তি ছিল না। পণ্ডিতেরা বলিয়া গিয়াছেন, দিবসে যাহা চিন্তা করা যায়, সময়ে সময়ে রাত্রিতে তাহা স্বপ্নাকারে মনোমধ্যে উপস্থিত হইয়া চিত্তবৃত্তির অস্থিরতা সম্পাদন করে। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর হইতে স্বামীর ভাবী অশুভ আশঙ্কা নির্ম্মলার একমাত্র আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি শশিভূষণের মানসিক ভাব সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিলেন; মাতৃবিয়োগ-নিবন্ধন পাছে তাঁহার আন্তরিক অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পায়, এই ভয় তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি ইহাই চিন্তা করিতে করিতে শুইয়াছিলেন, ইহাই চিন্তা করিতে করিতে ঘুমিয়েছিলেন, এবং নিদ্রিতাবস্থায়ও এই ভাবেরই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে পাইলেন তিনি যেন প্রাণপ্রতিম প্রিয়তম-হস্তে হস্ত রক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত মনে পর্ব্বত-শিখরে ভ্রমণ করিতে করিতে অরণ্য-শোভা বিলো-

কন করিতেছেন, মৃগযূথ তাঁহাদের উভয় পার্শ্বে নির্ভয়চিত্তে বিশ্রব্ধ ক্রীড়া করিতে করিতে আনন্দ-সলিলে মগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে; পার্ব্বতীয় বিহঙ্গমেরা বৃক্ষডালে বসিয়া স্ব স্ব পরিচায়ক বিবিধ স্বরে মৃদুমধুর ধ্বনি করিতেছে; এমন সময়ে হঠাৎ গগনমণ্ডল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইল, চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইল, অবিরলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তিনি যেন হস্ত ভ্রষ্ট হইয়া ভূশায়িনী হইলেন, প্রিয়তম উদ্দেশ্যে যেন কতই ডাকিলেন, কোন উত্তর পাইলেন না;. অবশেষে অতি কষ্টে যেন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দাঁড়াইয়া দেখিলেন অনতিদূরে ভীষণাকার এক ব্যাঘ্র দাঁড়াইয়া আছে, দেখিবামাত্র যেমন চিৎকার করিলেন অমনি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলেন শশিভূষণ শয্যায় নাই; চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে শয্যা-ত্যাগ করিয়া বহির্ভাগে আসিলেন।

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, শশিভূষণ ফিরিলেন না। নির্ম্মলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার আগমন অপেক্ষা করিয়া নিশ্চেষ্ট রহিয়াছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন তাঁহার আগমনের সময় অতীত হইয়া গেল, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; চতুর্দ্দিকে ভৃত্যবর্গ পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু কেহই কোন সংবাদ আনিতে পারিল না, অবশেষে তিনি নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। প্রতিবেশী, আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে সান্ত্বনা-বচন তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ে স্থান পাইল না, তিনি বিষণ্ণ-মনে সর্ব্বদা বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই রূপে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

শশিভূষণের পুত্রের নাম হেমচন্দ্র। হেম ছেলে মানুষ

কিছুই বুঝে না; সংসারের ঝঞ্ঝা তাহার গায় বাজিয়াও বাজে না; সে সর্ব্বদা প্রফুল্ল, সর্ব্বদা হাস্যমুখ, সমবয়স্ক বালকগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়াসক্ত। যখন বাড়ী আসিয়া মায়ের মুখ মলিন দেখিতে পায়, তখন কেবল ক্ষণকাল তরে সকল সুখ ভুলিয়া 'হাঁ' করিয়া মায়ের মুখপানে তাকাইয়া থাকে; কিন্তু তাহার এ অবস্থা ক্ষণস্থায়ী, সঙ্গীগণের সহিত মিলিত হইলেই পুনরায় আনন্দে মগ্ন হইয়া ক্রীড়া করিতে থাকে। আহা! বাল্যকাল কি সুখের কাল, এ কালে মনের কতই সুখ! শিশু-গণ! তোমরাই যথার্থ সুখী; তোমাদের সুখের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে রম্য হর্ম্ম্যবাসী বিলাসী ধনিগণের সুখ কি অকিঞ্চিৎকর! তোমাদের সরলতা ও মানসিক সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত পৃথিবীতে কাহার তুলনা হইতে পারে? ঐ যে দেখিতেছ কত শত লোক সুন্দর বসন-ভুষণে সজ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে রাজমার্গ তোলপাড় করিয়া চলিতেছে; আর ঐ যে দেখিতেছ শকটবাহনে হেলিয়া দুলিয়া মনের আনন্দে গা ঢালিয়া কত লোক চলিতেছে, উহাদের সুখের সহিত তোমাদের সুখের কি তুলনা হইতে পারে? কখনই নয়। এই উভয়বিধ সুখের বিশেষ পার্থক্য আছে, কাহারও সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না।

হেমচন্দ্র প্রতিদিন সমবয়স্ক বালকগণের সহিত নদী-তটে খেলিয়া বেড়ায়। একদা প্রাতঃকালে এইরূপ খেলা করিতেছে এমন সময়ে দেখিতে পাইল অনতিদূরে একখানা ছোট নৌকা ধীরে ধীরে চলিতেছে। নৌকাখানা ক্রমে ক্রমে তটাভিমুখে আসিতে লাগিল এবং অনতিবিলম্বে ছোট একটী খাল ধরিয়া গ্রামাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল। অল্প দূর অগ্রসর হইয়াই নৌকাখানা থামিল, এবং নৌকার অভ্যন্তর হইতে একটী যুবক

ম্লানমুখে, মলিন বেশে উপরে উঠিলেন। যুবককে দেখিয়া সমীপস্থ লোকের স্পষ্টতঃ প্রতীতি হইল, তিনি কোন দুঃসহনীয় ক্লেশ সহ্য করিতেছেন, তাঁহার সরলতা-ব্যঞ্জক মুখমণ্ডল চিন্তা-রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে, তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিসদৃশ চিন্তাজালে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, আর তাঁহার প্রফুল্ল মুখকান্তি অবস্থার বৈষম্যেই যেন মলিন ভাব ধারণ করিয়াছে। হেম ও তাহার সমবয়স্ক বালকগণ নৌকার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল ; যুবক তীরে উত্তীর্ণ হওয়ামাত্র সকলে তাঁহার চারিদিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। হেম এতক্ষণ চুপ করিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া মাঝীর পানে এক দৃষ্টে তাকাইতেছিল, কিন্তু যুবককে দেখিতে পাইয়া অমনি দৌড়িয়া যাইয়া তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিল, এবং বলিল "কাকা! তুমি এলে? বেশ হয়েছে ; মা বলেছেন বাবাও কাল আস্‌বেন, আমার দিদী কোথায়?" বিধুভুষণ হেমকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন ও ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন ; তাঁহার নেত্রযুগল হইতে আপনা আপনি বাষ্প নিঃসরণ হইতে লাগিল। অজ্ঞান হেম কিছুই বুঝিতে পারিল না ; চক্ষের জল দেখিয়া অনুমান করিয়া লইল বিধু কাঁদিতেছেন, অমনি ছোট ছোট হাত দুখানি দ্বারা চক্ষের জলে মুখ লেপিয়া ফেলিল এবং বলিল "কাকা! তুমি কাঁদ্‌চ কেন? তোমার ক্ষুধা পেয়েছে? চল্ল এখন বাড়ী যাই, মাকে বলিগে, তোমাকে খেতে দিবেন এখন।" "হাঁ চল এখন বাড়ী যাই, আমার ক্ষুধা পেয়েছে" বলিয়া বিধুভুষণ বাড়ী প্রস্থান করিলেন।

বাড়ী উপস্থিত হইয়া যাহা যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন তাহাতে তাঁহাব মন অবসন্ন হইল ; একটী বিপদ না যাইতে অন্য বিপদের আক্রমণ! বিধুভুষণ সমস্ত ভুমণ্ডল আঁধারময় দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার নিকট সমুদয়ই নিরানন্দ ও বিষাদময়

বোধ হইতে লাগিল। দুমাস পুর্ব্বে যাহাদের সহিত মনের আনন্দে কাল কাটাইতে ছিলেন, আজ তাহারা কোথায়—তাহারা এখনও সশরীরে পৃথিবীতে ঘুরিয়া ফিরিতেছে, অথবা জনমের তরে বিদায় গ্রহণ করিয়া কালকবলে পতিত হইয়াছে, তাহার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে বিধুভুষণ এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞান।

সময়ের স্রোত বহিতে লাগিল; বিধুভুষণ সম্বন্ধে ধীরে ধীরে বহিতে গাগিল। বিধুভুষণ আত্মীয় স্বজনের উপদেশানুসারে পুনরায় শশিভুষণের জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহারা কোন সংবাদ আনিতে পারিল না। অবশেষে তিনি স্থির করিলেন হেম এবং তাহার মাতাকে সঙ্গে করিয়া কার্য্যস্থানে চলিয়া যাইবেন; বাড়ী লোকশূন্য হইয়া থাকিবে। বিধুভুষণ ইহ জন্মের তরে বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইবেন স্থিরীকৃত হইল, ও তদনুসারে সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইতি মধ্যে নির্ম্মলার পীড়া হইল, পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া মারাত্মক হইয়া উঠিল, কবিরাজ চিকিৎসা করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না; ক্রমে রোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একদিন কবিরাজ হাত দেখিয়া বলিয়া গেলেন আজ নির্ম্মালার মৃত্যুদিন; নির্ম্মলাও ভাবিতে লাগিলেন 'আজ আমার শেষ দিন'; অনিমিষ নয়নে নির্ম্মলা হেমকে দেখিতে লাগিলেন; কতক্ষণ দেখিলেন বলিতে পারি না, কতক্ষণ পর চক্ষু আপনি বুজিয়া আসিল। সে চক্ষু বুজিয়াই রহিল, আর হেমকে দেখিবার জন্য উন্মীলিত হইল না।

যথাবিধি প্রেত-কার্য্য সম্পন্ন হইলে বিধুভুষণ হেমকে সঙ্গে করিয়া বিদেশ যাত্রা করিলেন; বাটীতে একমাত্র গোমস্তা ও ভৃত্য রহিল। সময়ে তিনি চাকরিস্থলে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ব কার্য্যে নিযোজিত হইলেন; হেম তাঁহার নিকট থাকিয়া নিকটস্থ

বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিল। বিধুভূষণ নবাব-সরকারে কার্য্য করিতেন। তাঁহার মনিব বাস্তবিক নবাব ছিলেন কি না জানি না; কিন্তু তাঁহার প্রজাগণ তাঁহাকে নবাব বলিয়া জানিত। প্রজাবর্গের মধ্যে তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল। যথেচ্ছাচার সম্বন্ধে আজ কালের ভাষায় তাহাকে এক জন ছোট-খাঁট রুশীয়-সম্রাটের ঠাকুরদাদা বলিলে অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। বিধুভূষণ জানিতেন কি প্রকারে এই সমস্ত অদ্ভূত জন্তুর প্রিয়পাত্র হইতে হয়। তিনি বুদ্ধিমান, চতুর ও কার্য্যে বিচক্ষণ ছিলেন; নবাব তাঁহাকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন। ক্রমে তিনি অত্যল্প সময়ের মধ্যেই নবাবের একটী প্রধান প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। বিধুভূষণ জানিতে পারিয়া ছিলেন এরূপ প্রভুর অনুগ্রহ ও বিগ্রহ একই কথা, তিনি নবাব হইতে স্থানান্তরে থাকিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভাগ্যক্রমে শাহাজাবাদের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ জানের সেই সময়েই মৃত্যু হয়, নবাবের অনুগ্রহে তিনি মৃত মহম্মদ জানের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে রাজধানী ত্যাগ করতঃ হেমচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া শাহাজাবাদ প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

নিদাঘ কাল, মধ্যাহ্ন সময় সূর্য্যদেব খরতর কিরণে স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। ঘাটে, মাঠে, পথে, কোথায়ও লোক দৃষ্ট হয় না। মাঝে মাঝে কেবল দুই একটী পশু চরিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদেরও এ তাপ সহ্য হয় না, অধিকাংশ পশু ঘাস ছাড়িয়া বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া সমীরণে

শরীর যুড়াইতেছে, কেহ রোমন্থ অভ্যাস করিতেছে, কেহ শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে, কেহ বা অর্দ্ধশয়িতাবস্থায় নবোৎপন্ন দূর্ব্বাঙ্কুর উঠাইয়া যথা সুখে চর্ব্বণ করিতেছে। প্রান্তরের যে দিকে চাও সে দিকেই দেখিবে সূর্য্যরশ্মি ধবলাগ্নিরূপে পরিণত হইয়া ধাঁ ধাঁ করিয়া জ্বলিতেছে। কখন কখন বায়ুসঞ্চারণে ধূলীরাশি উত্থিত হইয়া আরও বিকট শোভা ধারণ করিতেছে, কাহার সাধ্য এমন সময়ে মাঠে পা চালায়। অনতিবৃহৎ মাঠগুলির পানে তাকাও, দেখিবে উহারা এক একটী ছোট মরুভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে; আর ঐ বড় প্রান্তরের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, অমনি শাহারার মরুসাগরের কথা স্মৃতিপথে উদয় হইবে। উঃ! কি সন্তাপ! কি জ্বালা! কাহার সাধ্য বাহিরের দিকে ক্ষণকালের জন্য তাকায়!

এমন সময়ে কে তুমি ঐ প্রান্তরে ক্ষণে হাঁটিতেছ, ক্ষণে দৌড়িতেছ, ক্ষণে গুণ গুণ স্বরে আপনা আপনি গান গাইতে গাইতে দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে অবিশ্রান্ত চলিতেছ? কে তুমি উত্তপ্ত ধূলীরাশিতে সুকোমল পদদ্বয় ডুবাইয়া অর্দ্ধ নিমীল নয়নে সুদূরস্থ বৃক্ষাবলি দেখিতে দেখিতে আশার উপর নির্ভর করিয়া অতি কষ্টে পাদক্ষেপণ করিতেছ? তোমার প্রাক্তন প্রদেশস্থ স্বেদজলকণাসমূহ একে অন্যের সহিত মিলিত ও ধারারূপে পরিণত হইয়া কপোল দেশ ভাসাইয়া বহিতেছে। তোমার বড় কষ্ট হইতেছে? যাও, তবে যাও সুদূরে ঐ যে পাদপরাজি শোভিতেছে, উহার আশ্রয় যাইয়া গ্রহণকর। উহার ছায়ায় বসিয়া ক্ষণ কাল মনের সুখে শ্রমবিনোদন-সুলভ ফল ভোগ কর। দেখিবে, শরীর জুড়াইবে, মন প্রফুল্ল হইবে, অন্তঃকরণে শান্তি ও সুখ বিরাজ করিবে; অন্তরাত্মা পরমাত্ম-করুণরসে সিক্ত হইয়া কৃতজ্ঞতার রস উদ্গীরণ পূর্ব্বক মনোমালিন্য দূরীভূত করিব।

যুবক চলিতে লাগিলেন, তাঁহার দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞান নাই, অন্য দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, কেবল সেই নয়ন-রঞ্জন পাদপশ্রেণীতে বদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া অতি কষ্টে চলিতে লাগিল ; তাঁহার পদদ্বয় দগ্ধ হইতে লাগিল, শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল, তাঁহার এ অবস্থা দর্শনে সূর্য্যদেবের দয়া হইল না, তাঁহার প্রভাব তদবস্থই রহিল। তুমি সূর্য্যদেবকে নিষ্ঠুর বলিয়া গালিদিতে চাও ? দেও, আমি গালি দিব না,আমি বরং বিনয়াবনত বচনে কৃতাঞ্জলি পুটে বলিব "সূর্য্যদেব, তুমি দয়ার সাগর, তোমার তুলনা পৃথিবীতে নাই, তোমার ঐ খরতর কিরণে আমাদের কত উপকার করি-তেছে ; যদি তুমি পরমেশ্বর হইতে, তাহা হইলে তোমার চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া, তোমার কিরণে গা ভাসাইয়া, আর তোমার দয়ায় নির্ভর করিয়া মানব-জন্ম সফল করিতে প্রয়াস পাইতাম।"

মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, দণ্ডের পর দণ্ড, অতিবাহিত হইল, ক্রমে যুবক নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইলেন। সুখী কোন দিন সুখের আস্বাদন পায় না, যে অনবরত সুখাস্বাদন করিয়া আসিতেছে, তাহার নিকট সুখ, সুখকর হয় না। দুঃখী ব্যক্তিই বাস্তবিক সুখের অধিকারী। রাজাধিরাজ মহারাজ রাজপ্রাসাদে সুকোমল কিসলয়-নিন্দিত কুসুম-শয়নীতে শয়িত হইয়া যে সুখ ভোগ না করিতেছে, একটী রাখাল শারীরিক শ্রম-বিনোদনার্থ তরুমূলে দূর্ব্বাশয্যায় শয়িত হইয়া দেখিবে তাহা হইতে কত অধিক সুখভোগ করে। যে যে উপাদানে দুঃখী ব্যক্তির সুখ হয়, সেই সেই উপাদান অনেক সময়ে সুখী ব্যক্তির কেবল কষ্টের কারণ হইয়া উঠে। দুঃখী ব্যক্তির সুখ ও সুখী ব্যক্তির দুঃখ পরস্পর সমরাশি সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। দুঃখী অল্প সুখে সুখী হয়, সুখী অল্প দুঃখে কষ্ট পায়। ইহাদের পার্থক্য দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যাহারা অনবরত কষ্ট সহ্য করিয়া আসিতেছে,

তাহারা যত কষ্ট সহ্য করিতে সমর্থ, সুখী ব্যক্তি কি তত কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে? কখনই নয়। তবে আমরা দুঃখীকে সুখী বলিনা কেন? এক অর্থে দুঃখীই বাস্তবিক সুখী, সুখী দুঃখী। ঐ যে দেখিতেছ অরণ্যানিপ্রান্তে একটী যুবক অর্দ্ধ শয়িতাবস্থায় স্বকীয় শ্রম দূরীভুত করিতেছে, উহার এই সুখের সহিত তোমার সুখের তুলনা করিতে চাও? তুলনা করিলে দেখিতে পাইবে তোমার সুখ উহার সুখ হইতে কত পৃথক! তোমার সুখ, সূর্য্যকিরণে প্রদীপ শিখা, উহার সুখ তামসীর উজ্জ্বল দীপা-লোক।

যুবকের অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছিল, এখন ছায়ায় বসিয়া শ্রম বিনোদন করিতে লাগিলেন, গাছের পাতা তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিল। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর যুবক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সে দিকেই দেখিতে পাইলেন, বড় বড়, ছোট ছোট নানাবিধ গাছ বন-ভুমি আবৃত করিয়া রহিয়াছে; নানা প্রকারের বন-পাখী বৃক্ষ-ডালে বসিয়া মনের সুখে অব্যক্ত মধুরধ্বনি করিতেছে, স্থানে স্থানে কত সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিয়া সুগন্ধি বিস্তার করিতেছে। যুবক দেখিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন; তাঁহার মানসিক অস্থিরতা ক্ষণ-কালতরে একেবারে অস্তমিত হইল, তিনি সকৃতজ্ঞচিত্তে, আনন্দাশ্রু-নয়নে সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"—দেব? কে বলে তুমি কেহ নও? কে বলে তোমার অস্তিত্ব আকাশ-কুসুমের ন্যায় আমাদিগের অন্তরাত্মাকে প্রলুব্ধ ও বিপথগামী করিতেছে? তোমার সেই অপরিমেয় অনন্ত প্রভাব আজও কাহার জ্ঞানালোকের বহির্ভুত রহিয়াছে? এই যে কত

সুন্দর সুন্দর মনোহর বস্তু নিরীক্ষণ করিতেছি, ইহারা কি তোমার অস্তিত্ব বুঝাইয়া দিতে সমর্থ হইতেছে না ? কে ইহাদের স্রষ্টা ? এই যে কত সুন্দর সুন্দর গাছ দেখিতেছি, কোথা হইতে ইহাদের উদ্ভব ? বীজ হইতে ? বীজ কি ? বীজের স্রষ্টা কে ? যাহার যাহা ইচ্ছা হয় বলুক্, আমি আর প্রবঞ্চিত হইব না, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব, —তুমিই ইহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, তুমিই ইহাদের পরিপোষণকর্ত্তা, তুমিই ইহাদিগকে পরিবর্দ্ধন করিয়া আসিতেছ। এই যে পত্রে পত্রে, ফলে ফুলে নানাবিধ কারুকার্য্য-খচিত রেখা নিরীক্ষণ করিতেছি, ইহারা কি কিছুই সূচনা করে না ? ইহারা কি তোমার অসীম ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া, অনন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া তোমার সুমধুর দয়াল নাম প্রকাশ করিতেছে না ? তোমাকে কেহ দেখিতে পায় না, এজন্য কে বলে তুমি নাই ? কে তোমার অদর্শনকে তোমার অনস্তিত্বের কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছে ? বাতাস বহিতেছে, আমরা বাতাস দেখিতেছি না, এজন্য কে বলে, বাতাস নাই ? কেন, এই যে গাছ কাঁপিতেছে, ফুল নড়িতেছে, আমার শরীর শীতল হইতেছে,—এ কাহার প্রভাবে ? ইহার কি কারণ কিছুই নাই ? অবশ্যই আছে, বাতাসই ইহার কারণ। আমরা বাতাস দেখিতে পাই না, তবু বাতাস আছে, তোমাকে দেখিতে পাই না, তবু তুমি আছ। দেব, যেমন আমাদিগের প্রত্যেকের অনুভব-শক্তি বায়ুর অস্তিত্ব বুঝাইয়া দিতেছে, সেইরূপ এই নিখিলব্রহ্মাণ্ডস্থ যাবতীয় স্বাভাবিক বস্তু তোমার অস্তিত্ব স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করিতেছে। অসীম, অনন্ত তোমার ক্ষমতা ; কাহার সাধ্য তোমার এই ক্ষমতার অণুমাত্রও বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হয়। ভূমা পরমেশ্বর, তোমার সৌরভে দিঙ্-মণ্ডল আমোদিত হইয়া রহিয়াছে, তোমার নৈপুণ্যে সমস্ত জগৎ সংসার যন্ত্রবৎ পরিচালিত হইতেছে। আমরা তোমার

দয়ায় নির্ভর করিয়া, তোমার করুণার ফলভোগ করিয়া আমরণ কাল সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি।”

যুবক পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং ক্ষণকাল পরেই তাঁহাকে নিদ্রায় আক্রমণ করিল, তিনি বৃক্ষ-মূলে পর্ণ-শয্যায় সুখে নিদ্রাযাইতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব ক্রমে ক্রমে অস্তাচলে প্রস্থান করিতে লাগিলেন; চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল; বন-ভুমি পাখীর কোলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল; পবন-হিল্লোলে গাছের পাতা কাঁপিতে লাগিল, যুবক অকাতরে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন, কিছুতেই তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। রজনী গভীরা হইতে লাগিল, অন্ধকার ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইল; পৃথিবী নিস্তব্ধ; আর কোন শব্দ নাই; এখন আর পাখীর কুজন শুনা যাইতেছে না, বায়ু-প্রতিহত বৃক্ষপত্র হইতে এখন আর সপ্ সপ্ শব্দ কর্ণ-কুহরে প্রবেশ পাইতেছে না।

অনতিবিলম্বে যুবকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। যুবক উঠিয়া দেখিলেন রাত্রি হইয়াছে, জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, চতুর্দ্দিকে একটীও শব্দ হইতেছে না। চন্দ্রকিরণ বৃক্ষাবরণ ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে ভুপৃষ্ঠ আলোকিত করিয়াছিল, যুবক তাহাই দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনও কি তদ্বিষয়ের পর্য্যালোচনাতেই প্রবৃত্ত ছিল? কখনই নয়। তাঁহার মন বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত ছিল; তিনি মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন “এখন কি করিব? কোথায় যাইব? কোথায় যাইয়া অবস্থান করিব? পৃথিবীতে আমার সুখ নাই। কেন বাটী ত্যাগ করিয়াছিলাম? ত্যাগ করিয়াও কেন না ফিরিলাম, আমার কি আর কেহ ছিল না? কেন, ঐ যে একজন রহিয়াছিল, সে আমাকে কত ভাল বাসিত, কত আদর করিত! নির্ম্মলে! আমি বড় নিষ্ঠুর, আমি

তোমার ভালবাসায় অযথার্থ প্রতিদান করিয়াছি ; হায়, কেন তোমায় ফেলিয়া আসিয়াছিলাম, কেন আসিবার সময় তোমায় জানাইয়া আসিলাম না? অধুনা তাহার ফল-ভোগ করিতেছি। বাড়ী গেলে কি আর তোমায় পাইব? কখনই নয়! কেন, ঐ যে সে দিন দুটী লোক পথদিয়া বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, আমি গাছের আড়ালে লুকাইয়া তাহাদের কথা শুনিতে লাগিলাম ; তাহারা কি বলিল? তাহারা কি আমার অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিল না? তবে আমি তাহাদের সহিত ফিরিলাম না কেন? তাহাদের নিকট পরিচয় দিলাম না কেন? পরিচয় দিয়াই বা কি করিব ; যদি তাহাদের নিকট হইতে তোমার মৃত্যু-সংবাদ না পাইতাম, তাহা হইলে পরিচয় দিতাম ; বাড়ী যাইতাম, তোমাকে নয়নভরে আর একবার দেখিয়া আসিতাম। কিন্তু তুমি নাই, মা নাই, বাবা নাই, বাড়ী যাইয়া কাহাকে দেখিব? ছেলেটীকে? কেন, তাহাকে না দেখিলে কি হয় না? ঐ যে আর এক জন তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, তাহার যখন যে অভাব হইতেছে, অমনি সেই অভাব দূর করিতেছে। তবে আর আমি ফিরিব কেন? না—আর ফিরিবনা, আর বাড়ী যাইব না। পৃথিবীতে কেহ কারো নয়, তবে কেন আমি কাঁদিব? কাহার জন্য কাঁদিব? পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা কেহ কিছু নয়, সকলই জলবুদ্বুদবৎ একটী একটী করিয়া আসিতেছে, একটী একটী করিয়া অনন্ত-সাগরে লয় প্রাপ্ত হইতেছে।”

যুবক বসিয়াছিলেন, ক্ষণকাল পরেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও একদিক লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। যতই চলিতে লাগিলেন, ততই অরণ্যানি ভীষণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ; ক্রমাগত অনেক দূর চলিয়াও অন্য কিছু দেখিলেন না, কেবল

চতুর্দ্দিকে নানাবিধ বৃক্ষ সারি সারি শোভা পাইতেছে, দেখিতে পাইলেন। যুবক গতি পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য দিকে চলিলেন, এবং কিছু দূর যাইয়া একটী খাল দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ খাল ধরিয়া অনেক দূর চলিয়া গেলেন, তথাপি কিছু দেখিলেন না; অবশেষে হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। ক্ষণকাল পরে অস্পষ্ট মনুষ্য-কণ্ঠ-নিঃসৃত ধ্বনি যেন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি দাঁড়াইলেন ও শব্দের দিকে কর্ণ পাতিয়া রহিলেন। শব্দ অত্যন্ত অস্পষ্ট, ক্ষণে শুনা যাইতেছে, ক্ষণে বাতাসে লয় পাইতেছে। যুবক শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন; যতই নিকটে আসিতে লাগিলেন, ততই স্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলেন। অনতিবিলম্বে যুবক ঠিক করিলেন এ কোন শিশুর কান্না। বস্তুতঃ উহা অল্প বয়স্ক শিশুরই কান্না। যুবক ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইলেন, এমন সময়ে হঠাৎ কান্না থামিয়া গেল, আর কোন শব্দ পাইলেন না; তথাপি তিনি অনুমানে নির্ভর করিয়া চলিতে লাগিলেন। কতক দূর যাইয়া একটী অস্পষ্ট মনুষ্যাকৃতি দেখিতে পাইলেন। যুবক পিছে পিছে একটু দূর পথে সেই অস্পষ্টাকৃতির অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে শিশুটী পুনরায় কাঁদিতে লাগিল, যুবক তখনি শুনিতে পাইলেন ঐ অস্পষ্টাকৃতি লোক ক্রোড়স্থ রোরুদ্যমান শিশুটীকে বলিতেছে—"চুপ, আর কাঁদিওনা, কাঁদিলে ঐ স্থানে ফেলিয়া দিব।" যুবক এবার সাহসে নির্ভর করিয়া জিজ্ঞাসিলেন "কে তুমি?" তাহার শব্দ পাইয়া ঐ অস্পষ্টাকৃতি অমনি ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিল; যাইবার সময় অঙ্কস্থিত শিশুটীকে সজোরে ভুমিতে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল।

যুবক দেখিয়া নিতান্ত আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা

করিতে লাগিলেন এবং চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; কোথাও কাহাকে দেখিলেন না। শিশুটীর সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত ছিল দেখিতে পাইয়া যুবক আরও আশ্চর্য্য হইলেন। শিশুর বয়ঃক্রম এক বৎসর হইবে; তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও সমস্ত বিষয় স্পষ্টতঃ অবগত হওয়া অসম্ভব। ঐ স্থানে আর অধিকক্ষণ বিলম্ব না করিয়া, যুবক, যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথেই চলিতে লাগিলেন। কতকদূর যাইয়া অন্য একটী শব্দ শুনিতে পাইলেন। কিন্তু এ শব্দ পূর্ব্ব শব্দের অনুবৃত্তি নহে; এ যেন কাহার আর্ত্তনাদ। যুবক শব্দ লক্ষ্যে কিয়ৎদূর চলিয়া গেলে ক্রোড়স্থ শিশুটী অঙ্গুলীদ্বারা একটী স্থান দেখাইয়া অমনি কাঁদিয়া উঠিল। যুবক সেই স্থানে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহার অঙ্গ শিথিল হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া দেখিলেন, কিছুই দেখিলেন না; তিনি স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। শিশুর কান্না শুনিয়া পুনরপি সেই আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল, যুবক আরও নিকটে যাইয়া দেখেন একটী হস্ত-পদ-শূন্য মনুষ্য-দেহ ধূলীতে বিলুণ্ঠিত হইতেছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত। যুবক বুঝিতে পারিলেন তাহার কথা কহিবার শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে, সুতরাং তাহাকে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?" তোমার এ দশা কেন? আমার ক্রোড়স্থিত এ কন্যাটী কে? তোমার কি হয়? বল; আমি তোমার শত্রু নই; আমাদ্বারা তোমার যতদূর উপকার হইতে পারে, করিতে প্রস্তুত আছি।" আহত ব্যক্তি অপরিস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিল "এখন আমার মৃত্যু-সময়; সত্য কথা বলিতে কি? মহাশয়, আমরা ব্যবসায়ে মাঝী; দিন কতক হইল আমরা দুটী ভদ্র লোকের ভাড়া লইয়াছিলাম; দুর্ভাগ্যবশতঃ ঝড়ে আমাদের নৌকা ডুবিয়া যায়। আপনার ক্রোড়ে যে

কন্যাটী রহিয়াছে এটীকে সেই নৌকাডুবির সময় আমরা রক্ষা করি; আমি ইহার স্বর্ণালঙ্কার দেখিয়া লোভবশতঃ ইহাকে মারিয়া অলঙ্কার আত্মসাৎ করিবার যত্ন পাই; কিন্তু আমার আর একটী সঙ্গী মাঝী ইহাতে অস্বীকার হয়। আজ আমি তাহাকে না জানাইয়া কন্যাটীকে এই অঘোর অরণ্যে আনিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম আমার সঙ্গী কন্যাটীকে না দেখিয়া মনে মনে স্থির করিবে 'হারাইয়াগিয়াছে'; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমার এই স্থানে পঁহুছিবার ক্ষণকাল পরেই আমার সঙ্গী আসিয়া উপস্থিত হয়, পরে আমার এই দশা ঘটিয়াছে।" যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার সঙ্গী কোথায়?" আহত ব্যক্তি অতি কষ্টে বলিল "বোধ হয় কেহ জানিতে পারিবে বলিয়া পলায়ন করিয়াছে।"

শশিভূষণ জিজ্ঞাসিলেন "এ কন্যাটী কাহার?" এবার আর কোন উত্তর পাইলেন না; অনতিবিলম্বে আহত ব্যক্তির প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। যুবক আর সেই স্থানে অপেক্ষা না করিয়া সম্মুখস্থ অস্ত্রদ্বয় লইয়া শিশুটীকে ক্রোড়ে করিয়া সমস্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"These violent delights have violent ends,
And in their triumph die. The sweetest honey
Is loathsome in its own deliciousness,
And in the taste confounds the appetite.
Therefore, love moderately; long love doth so.
Too swift arrives as tardy as too slow."

পূর্ব্বকালে জমীদারগণ বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। জমীদারীর অন্তর্গত স্থান তাঁহাদের যথেচ্ছাচার-শাসন-প্রণালী দ্বারা

শাসিত হইত ; তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই প্রজাবর্গের ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে পারিতেন, যৎকিঞ্চিৎ দোষ পাইলেই প্রজাগণের প্রাণদণ্ড করিতে পারিতেন,—সংক্ষেপতঃ প্রজাবর্গের ধন, মান, প্রাণ প্রভৃতি সমস্তই তাঁহাদের দয়ার উপর নির্ভর করিত। কিন্তু সুখের বিষয় এই, সকল জমীদার একরূপ ছিলেন না, সকলেই স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য প্রজাগণের উপর উৎপীড়ন করিতেন না। আজ কালের জমীদারের উপরে প্রজার যেরূপ ভাব, পূর্ব্বকালের জমীদারের উপর প্রজার সে রূপ ভাব ছিল না। তাহারা জমীদারকে রাজার মত দেখিত। প্রকৃত পক্ষে জমীদারগণও এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন। আমরা যে যে জমীদারের কথা উল্লেখ করিব, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের অধীনে অনেকগুলি করিয়া সৈন্য থাকিত, প্রত্যেকের জমীদারীর প্রান্ত ভাগে এক একটী সীমাস্তম্ভ প্রোথিত থাকিত। সীমাস্তম্ভ প্রোথিত থাকার তাৎপর্য্য এই, তাহা হইলে আর এক জমীদার অন্য জমীদারের স্থান অধিকার করিতে সুযোগ অথবা প্রয়াস পাইতেন না।

পূর্ব্বে আমরা যে একটী মুসলমান নবাবের কথা বলিয়াছি, তাঁহার নাম হুসেন আলী। তিনি আদৌ দিল্লী-সম্রাটের অধীনস্থ জনৈক কর্ম্মচারি ছিলেন, তাঁহার উপর সম্রাটের একান্ত অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। স্বকীয় বুদ্ধিবলে তিনি হুসেনপুরের শাসনকর্ত্তার পদে নিয়োজিত হন, এবং অল্পকাল মধ্যেই ঐ স্থানে তাঁহার একাধিপত্য স্থাপন করেন। প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর তিনি সম্রাটকে নিয়মমত কর প্রদান করিতেন। কিন্তু যখন দেখিতে পাইলেন কর প্রদান না করিলেও তাহাদ্বারা বিশেষ কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন হইতে কর দেওয়া বন্ধ করিলেন। তিনি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ ছিলেন।

কতিপয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার ক্ষমতা এতদূর প্রবল হইয়া উঠিল যে তিনি অকুতোভয়-চিত্তে সম্রাট-সমীপে আপনাকে একটী স্বাধীন নবাব বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। সম্রাট তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকবার সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু প্রতিবারেই তাঁহার সৈন্য যুদ্ধে পরাস্ত হয়। অবশেষে তিনি আর প্রতিবিধানের বিশেষ কোন চেষ্টা করিলেন না।

আমরা এখন হইতে হুসেন আলীকে নবাব বলিয়া ডাকিব। ইহাঁর বাড়ী বড় এক প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। প্রাচীরের চতুঃপার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি দুর্গ ছিল; উহারা বৃহৎ একটী পয়োনালা দ্বারা বেষ্টিত। যে প্রাচীরের কথা বলিলাম উহার মধ্যে এত স্থান ছিল যে নবাবের বাসস্থান, ক্রীড়াকানন প্রভৃতি হইয়াও অনেক স্থান শূন্য পড়িয়া থাকিত। নবাবের বাটী চারি ভাগে বিভক্ত ছিল, প্রথম ভাগে তাঁহার কাছারি প্রতিষ্ঠিত ছিল, অন্যান্য তিন ভাগ তাঁহার অন্তঃপুরে পরিগণিত।

একদা সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটী বর্ষীয়ান নবাবের অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া, অনতিদূরস্থ একটী দুর্গে প্রবেশ করিল। ইহার হস্তে এক খানা পত্র ছিল। বৃদ্ধাকে দেখিবামাত্র দ্বারবান দ্বার ছাড়িয়া দিল। বৃদ্ধা অনতিবিলম্বে সোপানাবলী আরোহণ পূর্ব্বক দ্বিতল গৃহস্থ একটী সুরম্য কামরাতে প্রবেশ করিলেন। কামরাতে চতুর্ব্বিংশ বর্ষীয় একটী যুবক উৎকণ্ঠচিত্তে বসিয়াছিলেন; বৃদ্ধাকে দেখিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও সসমাদরে সমীপস্থ আসনে বসাইলেন। বৃদ্ধার নিকট যে পত্রখানা ছিল কামরাতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই সেই পত্র অতি সাবধানে গোপনে রাখিয়া ছিলেন। শূন্য হস্তে বৃদ্ধাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া যুবক বলিলেন "তার পর, কি করে আস্‌লে?"

বৃদ্ধা উত্তর করিল "আর কি কর্‌বো, আমিতো পুর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে এ আর কেহ নয়।"

যুবক। সেই পত্রখানা তাহাকে দিয়াছিলে?

বৃদ্ধা। হাঁ।

যুবক। তার পর? তার পর সে কি বলিল?

বৃদ্ধা। কিছুই নয়।

যুবক। না সে এমন লোক নয়, আমি তাহার স্বভাব বিশেষরূপে জানি, তুমি আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিতেছ; তোমার কথায় আমার বিশ্বাস হইতেছে না।

বৃদ্ধা। তুমি জান দিন দু চারি যাবৎ, আমি জানি আশৈশব হইতে; আমার কথায় যদি বিশ্বাস নাই কর, তবে আর আমার এখানে থাকিয়া কি হইবে? আমি তবে এখন যাই।

বৃদ্ধা উঠিয়া যাইতেছিল, যুবক তাহাকে পুনরায় বসাইলেন, এবং কাতর স্বরে বলিলেন "আর একটু বস, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করে নেই; সত্য সত্য বল দেখি পত্রখানা পাইয়া সে কি করিল?"

বৃদ্ধা। পত্রখানা পাইয়া ক্ষণকাল পরেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিল।

যুবক। একবার পড়িলও না?

বৃদ্ধা। কে জানে, এত অল্প সময়ের মধ্যে কি পড়া হয়? হাতে দিলাম পর পত্রখানার দিকে একটু চাহিয়া রহিল, পরক্ষণেই হাসিতে হাসিতে ছিঁড়িয়া ফেলিল।

যুবক। হাসিতে হাসিতে ছিঁড়িল কেন?

বৃদ্ধা। বোধ করি তোমার দুরাশার কথা ভাবিতে ভাবিতে হাসিতেছিল।

যুবক। আমার দুরাশা? কেন?

বৃদ্ধা। বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতেছ কেন?

যুবক। আমি বামন কিসে? আমি কি এমনি অপদার্থ? আমার কি কোন গুণ নাই? কোন ক্ষমতা নাই? নবাবের নবাবত্ব আমি রক্ষা করিতেছি, প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে পরাভব করিয়া আমিই তাঁহার সিংহাসন নিরুপদ্রব করিয়াছি। আমি, আমি বামন? ভাগ্যে তুমি স্ত্রীলোক, নচেৎ এখনি ইহার প্রতি-ফল দিতাম।

বৃদ্ধা। কেন, মেরে ফেল্‌বে না কি?

যুবক। তোমার যেতে হয় যাও, আর আমাকে বিরক্ত করিও না। বৃদ্ধা সেই সময়ে যুবকের হস্তে একখানা পত্র দিয়া বলিল "তবে এখন বিদায় হই।"

যুবক পত্র পাইয়া আনন্দে বিভোর হইলেন, অনতিবিলম্বে গমনোম্মুখী বৃদ্ধার নিকট সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং তাহাকে পুনরায় নিকটস্থ আসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

বৃদ্ধা বসিলেন। যুবক পত্রখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন; একবার পড়িলেন, তাহাতে হইল না; অবার পড়িলেন। ক্ষণ-কাল পরে পত্র খানা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। যুবক এবার গম্ভীর হইয়া বসিলেন; দেখিয়া বৃদ্ধা বলিল "এবার কোন উত্তর দিবে?" "হাঁ, দিব" বলিয়া যুবক পত্র লিখিতে বসিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে পত্র খানা বৃদ্ধার হস্তে দিয়া বলিলেন "এই নেও, এই পত্র আর কাহাকেও দেখাইও না।"

বৃদ্ধা। তুমি ঐ পত্র খানা ছিঁড়িলে কেন?

যুবক। গোপনীয় কথা আছে বলে।

বৃদ্ধা। ভাল, আমি গিয়ে তাহার নিকট বলি যে তুমি তাহার পত্র খানা না পড়িয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছ।

যুবক। না, আর তাহাকে কষ্ট দিও না; সে অনেক দিন

যাবৎ কষ্ট পাইতেছে, আর পরিহাস করিয়া তাহাকে জ্বালা-ইও না।

বৃদ্ধা বিদায় হইল, যুবক অন্য-মনে বসিয়া রহিলেন। বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন; একবার হাসিলেন, এক-বার কাঁদিলেন, একবার আরক্ত-নয়নে মুষ্টি বদ্ধ করিয়া বাহিরের দিকে তাকাইলেন। যুবকের আজ এ ভাব কেন? কে বলিবে। কত সময় তাহার এ ভাব ছিল, তাহাও জানি না। ক্রমে রজনী গভীরা হইল; যুবক আহারান্তে শয়ন করিলেন, নিদ্রা হইল না। কাহার নিদ্রা আসিবে? যে আজ চিন্তা-সলিলে নিমগ্ন; যাহার সমস্ত আশা, সমস্ত ভরসা পার্থিব সমস্ত সুখ আজ নষ্ট-প্রায়, তাহার নিদ্রা আসিবে কেন? যুবক শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং কালি কলম লইয়া পত্র লিখিতে বসিলেন। লেখা শেষ হইলে জনৈক ভৃত্যদ্বারা যথা স্থানে পত্র পাঠাইয়া দিলেন।

পত্র-বাহকের নাম খোদাবক্স। খোদাবক্স অনতিবিলম্বে পত্র খানা লইয়া প্রস্থান করিল এবং যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া একটী মুসলমান যুবকের হস্তে সেই পত্র খানা প্রদান করিল। যুবকের আকৃতি সুন্দর, বয়স আনুমানিক ত্রয়োবিংশ। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ ও মাংসাল, যুবক বহুমূল্য পরিধানে বিভুষিত ছিলেন। তাঁহার আকৃতি দর্শনে তাঁহাকে মহৎবংশীয় বলিয়া অনুমান হয়, এবং এ অনুমানও সর্ব্বথা সত্য। তাঁহার পিতা প্রসিদ্ধ শিয়ার আলী সম্পর্কে নবাবের ভ্রাতা ছিলেন। যুবক পিতৃ-অনুমতিতে নবাবের সাক্ষাৎলাভের জন্য হুসেনপুর আসি-য়াছিলেন; কিন্তু নবাবের অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া ঐ স্থানে বৃথা কাল কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যুবক বিদায় চাহিলে নবাব তাঁহাকে বিদায় দেন না, তিনিই বা নবাবের বিনা-

নুমতিতে কি প্রকারে প্রস্থান করেন। অগত্যা আরও কয়েক দিন ঐ স্থানে থাকিবেন এবং বিদায় লইয়া বাড়ী যাইবেন, এই ঠিক করিয়া যুবক অতি কষ্টে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

যুবকের নাম মিঞাজান। প্রধান সেনানী নাজিমদ্দির সহিত অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। তিনি নাজিমদ্দিকে তাঁহার একটী বিশ্বাসী বন্ধু বলিয়া জানিতেন; অধুনা তাঁহার পত্র পাঠ করিয়া নিতান্ত আশ্চর্য্য হইলেন। এত্ রাত্রে কেন তাঁহাকে যাইতে লিখিয়াছেন, ইহার কারণ কি, মিঞাজান কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। তিনি অনতি-বিলম্বে খোদাবক্সের সহিত নাজিমদ্দির শিবিরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

খোদাবক্সকে বিদায় দিয়া নাজিমদ্দির মন অপেক্ষাকৃত অধিক চঞ্চল হইয়াছিল। "মিঞাজান সরল, বন্ধুপ্রিয়, আমাকে প্রাণের সমান ভালবাসে, এখন আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে কি বলিব? সে যখন জিজ্ঞাসা করিবে 'এত রাত্রে কেন?' তখন কি উত্তর করিব?" নাজিমদ্দি বসিয়া বসিয়া এই চিন্তা করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে খোদাবক্স আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র নাজিমদ্দির শরীর চমকিয়া উঠিল, খোদা-বক্স তাহা দেখিয়াও দেখিল না। মিঞাজানের আগমন সংবাদ পাওয়া মাত্র নাজিমদ্দি স্বয়ং মিঞাজানকে অভিবাদন পুর্ব্বক স্বকীয় কামরায় লইয়া আসিলেন। মিঞাজান যথাস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক নাজিমদ্দিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার জন্য এত রাত্রে লোক পাঠিয়েছ কেন? বোধ হয় বিশেষ কোন দরকার আছে।"

নাজিমদ্দি। হাঁ, দরকার না থাকিলে এতরাত্রে তোমাকে কষ্ট দিব কেন?

মিঞাজান। আমার এমন বিশেষ কোনও কষ্ট হয় নাই, তজ্জন্য তুমি লজ্জিত হইও না।

নাজিমদ্দি। কষ্ট হইলেই বা কে মুখে বলিয়া থাকে? আমি লজ্জিত নই, কারণ আমি জানি তুমি বন্ধু-বাক্য প্রতি-পালনের জন্য কষ্টকে কষ্ট বোধ কর না।

মিঞাজান। ভাল তাহাই হউক, এখন বল দেখি, সেই দরকারটী কি?

নাজিমদ্দি। এমন বিশেষ কিছু নয়; আমার মনটা বড় খারাপ ছিল; একাকী বসিয়া থাকিব, তাই তোমার জন্য লোক পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। অপরাধ মাপ করিও। আরও একটী কথা আছে।

মিঞাজান। কি কথা?

নাজিমদ্দি। তোমাকে একটী শুভ সংবাদ দিব।

মিঞাজান। কি সংবাদ?

নাজিমদ্দি। তুমি সময়ে আমাদের এ মুল্লুকের নবাব হইবে।

মিঞাজান। সে কি? এই না তুমি বলিয়াছ তোমার মন খারাপ আছে; মন খারাপ থাকিলে কি রূপে এই রূপ পরিহাস করিতেছ?

নাজিমদ্দি। এটী বাস্তবিক পরিহাসের কথা নয়; আমি সত্য সত্যই বলিতেছি তুমি এ মুল্লুকের নবাব হইবে, অলোক-সামান্যা রূপবতী কামিনী অবিলম্বে তোমার হস্তে অর্পিত হইবে।

মিঞাজান। তুমি ইতিপূর্ব্বে আমাকে কোন দিন পরিহাস কর নাই, এখন এরূপ করিতেছ কেন?

নাজিমদ্দি। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি,

তোমাকে পরিহাস করা আমার উদ্দেশ্য নয়। পরিহাস করিবার জন্য এত রাত্রে তোমাকে এত কষ্ট দিব কেন? আমাকে বিশ্বাস করিও, আমি সত্য কথা বলিতেছি; অবিলম্বে এ রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী নবাব-তনয়া রেজিয়ার সহিত তোমার বিবাহ হইবে।

মিঞাজান। তুমি কি রূপে জানিলে? আমিতো ইহার কিছুই জানিনা; এ জনরব সম্পূর্ণ মিথ্যা।

নাজিমদ্দি। না মিঞাজান, এ জনরব মিথ্যা নয়; মিথ্যা হইলে নবাব তোমাকে এত ভাল বাসেন কেন? এত দিন বাড়ী যাইতেই বা অনুমতি করেন নাই কেন?

মিঞাজান। আমি তোমার কথার ভাব কিছুই বুঝিতেছি না; তুমি এ সংবাদ কাহার নিকট শুনিলে?

নাজিমদ্দি। নবাব-পুত্রী হইতে।

মিঞাজান। আমার স্মরণ হয় কয়েক দিন পূর্ব্বে তুমি বলিয়াছিলে রেজিয়া তোমাতে অনুরাগিণী, তুমিও নাকি তাহাকে প্রাণের সমান ভাল বাস?

নাজিমদ্দি। মনে কর এখন আমাদের সে ভাব নাই; নবাব প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তোমার সহিত রেজিয়ার বিবাহ দিবেন।

মিঞাজান। নবাব প্রতিশ্রুত হইলেও আমি তাহাতে প্রতিশ্রুত নই, আমার অমতে তিনি কি রূপে বিবাহ দিবেন?

নাজিমদ্দি। গত কল্য তোমার পিতার সমীপে দূত প্রেরিত হইয়াছে। তোমার পিতা অনুমতি করিলেই বিবাহ হইবে।

মিঞাজান। পিতা অনুমতি করিলেও বিবাহ করিব না।

নাজিমদ্দি। কেন? রূপে গুণে, কুলে এমন স্ত্রী কোথায় পাইবে?

মিঞাজান। পাই, আর না পাই, আমি এ বিবাহ করিব কেন? তোমাদের উভয়ের সুখে কণ্টক দিব কেন? আমি এপর্য্যন্ত রেজিয়াকে দেখি নাই, সেও আমাকে দেখে নাই, আমাদের মধ্যে অনুরাগও বদ্ধমূল হয় নাই। আমি এ বিবাহে কখনও সম্মত হইতে পারি না।

নাজিমদ্দি। তুমি নাই বা সম্মত হইলে, নবাব জোর করিয়া বিবাহ করাইবেন।

মিঞাজান। তাঁহার এমন ক্ষমতা নাই।

নাজিমদ্দি। কেন? তুমি নিঃসহায়, সে সহায়-সম্পন্ন।

মিঞাজান। আমি নিঃসহায় কিরূপে? এই যে তুমি প্রধান সেনানী আমার প্রধান সহায় রহিয়াছ।

তাঁহারা এইরূপ আলাপ করিতেছেন এমন সময়ে একটী শঙ্কেত-ধ্বনি হইল। নবাবের আদেশানুসারে প্রতি রাত্রিতে ঐরূপ এক একটি শব্দ করা হইত, এবং শব্দের অব্যবহিত পরেই নবাব-বাটীর দ্বার রুদ্ধ হইত। অধুনা সেই শব্দ শুনিতে পাইয়া মিঞাজান বিদায় গ্রহণ করিলেন; নাজিমদ্দি অতি কষ্টে এবার তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

মিঞাজান বিদায় হইলে নাজিমদ্দি শয়ন করিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না। তিনি মনে মনে আপনাকে শতবার ধিক্কার করিয়া মিঞাজানকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এভাব অধিক সময় স্থায়ী হইল না। তিনি বিষয়ান্তরে মনো-নিবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন, তাহাও পারিলেন না। তাঁহার মন যে চিন্তায় পূর্ণ ছিল, সেই চিন্তাই তাঁহার নিকট মনোহর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন "আহা! মিঞাজান, তুমি কি সাধু-প্রকৃতির লোক, তুমি আমাকে কত ভাল বাস; আমার সুখের জন্য তুমি নিজের

সুখ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছ, অথচ আমি তোমার ভাল-বাসা দেখিয়াও দেখিতেছি না। তুমিই জান কি প্রকারে ভাল বাসিতে হয়; এ ভালবাসার তুলনা নাই, এ ভালবাসার প্রতি-দান নাই। কিন্তু আমি কি করিতেছিলাম? নিষ্ঠুর, পামর, নরহন্তা নাজিমদ্দি তোমার ভালবাসার কিরূপ প্রতিদানে কৃত-সঙ্কল্প ছিল? যাহাকে তুমি স্পর্শসুখ-মণি বলিয়া ভাবিতেছ, সে স্পর্শসুখ-মণি নয়, সে স্বার্থ-সিদ্ধি বিষয়ে আজ কাল জ্বলন্ত অঙ্গার-খণ্ড। হায়! কেন তুমি এ স্থানে পদার্পণ করিয়াছিলে? কেন তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আর কেনই বা আমার প্রতি তোমার ভালবাসা এতদূর দৃঢ়ীভুত হইল? তুমি সরল, তোমার ঐ সরলতাকে পূর্ব্বে আমি বড় ভাল বাসিতাম, এখনও ভাল বাসি। কিন্তু তোমার ঐ সরলতায় কি আমার অনিষ্ট হইতেছেনা? তুমি যদি সরল না হইতে তাহা হইলে স্বার্থ নাশে বন্ধুর তুষ্টি সম্পাদনে যত্নবান হইতে না, এবং তাহা হইলে স্বার্থতার অনুরোধে, বন্ধুতা-শৃঙ্খল অতি সহজেই ভগ্ন হইয়া যাইত, আমারও তাহাতে একটা উপায় হইয়া দাঁড়াইত। আমি স্বার্থের দাস, তুমি জিতেন্দ্রিয়। তোমার ঐ সরলতাই এখন আমার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুমি যদি সরল না হইতে, অশঙ্কুচিত চিত্তে তোমার প্রতি শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম, এবং তাহা হইলেই আমার মঙ্গল হইত। তোমার ঐ সরলতাই আমার সহিত চাতুরী করিতেছে, আর আমি তোমার সরলতায় ভুলিব না; আর তোমার মধুর কথা শুনিয়া, তোমার ঐ বিষকুম্ভ-শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া প্রতারিত হইব না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ইহারই নাম দিল্লী? ইহারই যশঃঘ্রাণে উন্মত্ত হইয়া তাইমুর, নাদির শাহ প্রভৃতি মহামহিম মহীপতিগণ নানাবিধ কষ্ট সহ্য করিয়াও, ইহারই প্রাসাদোপরি স্ব স্ব জয়পতাকা উড্ডীন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন? হায়, আজ তোমার এ ভাব কেন? আজ তোমার ঐ প্রাসাদোপরি নানারঙ্গে রঞ্জিত বিবিধ ধ্বজ-পতাকা আকাশে উড়িয়া বায়ুভরে খেলিতেছে না কেন? তোমার ঐ সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক কত কত প্রতাপান্বিত নরপতিগণ যথানিয়মে রাজ্য শাসন করিয়া স্ব স্ব জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন। হায়! তোমার সে সময় এখন কোথায়? তোমার যে সিংহাসন পরাক্রান্ত নরপতিগণের উপ-বেশনস্থান ছিল, আজ তাহাতে বিলাসী, অলস, আমোদপ্রিয় এক পাষণ্ড উপবিষ্ট রহিয়াছে; তোমার যশস্তম্ভ তাহার আমোদ-লহরী দ্বারা নিরবধি প্রক্ষালিত হইতেছে; আজ আর তোমার সেই শোভা নাই, আজ আর তোমার সেই গৌরব নাই। তোমার দ্বারে দ্বারে শত সহস্র যোদ্ধা রণবেশে সর্ব্বদা সজ্জিত থাকিত, তোমার ঐ সিংহাসন-পার্শ্বে কত মহামহিম রাজপুত যোদ্ধৃগণ করযোড়ে সশঙ্কচিত্তে দণ্ডায়মান থাকিত, আজ আর তাহারা কোথায়? আজ আর তাহারা তোমার দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায় না, আজ আর তাহারা করযোড়ে সশঙ্কচিত্তে তোমার ঐ সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হয় না। তাহাদের সে সময় ফিরিয়াছে, তোমারও আর সে সময় নাই। এখন তাহারা প্রত্যেকে এক একটী জ্যোতিষ্মান সূর্য্য, তুমি তাহাদের প্রত্যেকের নিকট চন্দ্ররূপে অবস্থিতি এবং প্রত্যেকের আলোকে

আলোকিত হইয়া, তাহাদের গতির অনুবর্ত্তন করিতেছ। তোমার ঐ আলোকে সুখ নাই, তোমার ঐ গতিতে স্বাধীনতা নাই। তুমি একবার পূর্ণকলায় হাসিতেছ, একবার প্রতিপচ্চন্দ্রের ন্যায় নিবি নিবি জ্বলিতেছ, আর কখনও বা অমানিশির অন্ধকারে সম্পূর্ণ রূপে লুকায়িত হইতেছে। আজ তোমার ঐ জ্যোতি আমার নয়ন রঞ্জন করিতেছে না, উহা নির্ব্বাণ দীপের পূর্ব্ব-সময়-সুলভ জ্যোতির ন্যায় নির্ব্বাণ সূচনা করিতেছে।

রজনী প্রহরেক গত-প্রায়। গগনমণ্ডলে ভগবান চন্দ্রমা নক্ষত্রমালা পরিবেষ্টিত হইয়া স্বকীয় শোভা প্রকাশ করিতেছেন। এমন সময়ে দিল্লী নগরের এক ক্রোশ পূর্ব্বস্থ নিবিড় কাননে দুই জন অশ্বারোহী পুরুষ ভ্রমণ করিতে করিতে সমীপস্থ এক কুটজালয়ে উপস্থিত হইলেন। তখন সেই কুটজালয়ে আরও তিনটী লোক ছিলেন; আগন্তুক যুবকদ্বয় দ্বারদেশে উপস্থিত হওয়া মাত্র তাঁহারা সকলে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। আগন্তুকদ্বয়ের মধ্যে একটি যুবক অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ; তাঁহার বর্ণ কাল, শরীর সবিশেষ দৃঢ় ও কার্য্যক্ষম, আকৃতি ভীষণ অথচ সুন্দর। দেখিবামাত্র বোধ হয় তিনি একটী অসামান্য লোক। ক্ষণকাল সকলে নীরব রহিল, কাহারও মুখ হইতে একটী শব্দ নির্গত হইল না; গাছের পাতা বাতাসে নড়িতেছিল, তাহারাই নীরব অরণ্যানি সপ্ সপ্ শব্দে পূর্ণ করিতেছিল। কিয়ৎকাল পরে একটী যুবক উটজপার্শ্বে উপবেশন পূর্ব্বক সমীপস্থ সকলকে চুপে চুপে বলিলেন "কোথায়, তাহারা এখনও আসিল না কেন?"

২য় যুবক। বোধ হয় তাহারা পথ-ভ্রষ্ট হইয়াছে।

৩য় যুবক। বসুরদ্ধি পথ হারাইবার লোক নন্।

৪র্থ যুবক। তাহা হইলে তাহাদের এত বিলম্ব কেন?

১ম যুবক। তোমরা ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি একবার দেখিয়া আসি।

২য় যুবক। আপনার একাকী যাইয়া কি হইবে? অনুমতি হইলে অধীনও আপনার পশ্চাদ্গামী হয়।

তাঁহারা এইরূপ কথা বলিতেছেন এমন সময়ে অনতিদূরে একটী বিকট শব্দ হইল। শব্দ শুনিয়া আর যুবকদ্বয় প্রস্থান করিলেন না। অনতিবিলম্বে সশস্ত্র দুই শত অশ্বারোহী পুরুষ আসিয়া কুটজদ্বারে উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্য হইতে একটী যুবক প্রথম যুবকের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে সসমাদরে অভিবাদন করিলেন। পাঠক! এ প্রথম যুবককে চিনিতে পারিলেন? এ আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত নাজিমদ্দি। নাজি-মদ্দি জিজ্ঞাসা করিলেন "বসুরদ্দি, তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন?

বসুরদ্দি। একটী সমূহ বিপদ উপস্থিত হওয়াতে।

নাজিমদ্দি। সে কি?

বসুরদ্দি। সম্রাটের একটী চর অশ্বারোহণে কোথায় যাইতে ছিল, আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া অমনি বল্গা ফিরাইয়া দিল্লী প্রস্থান করিতেছিল।

নাজিমদ্দি। তার পর?

বসুরদ্দি। তার পর 'আমি আমার সৈন্যগণকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাহার পশ্চাদ্গামী হই এবং অবিলম্বে তাহাকে আক্রমণ করি।"

নাজিমদ্দি। তবে সে এখনও তোমাদের সঙ্গে আছে?

বসুরদ্দি। হাঁ, অনুমতি হইলে এখনি লইয়া আসি।

"তাহাই হউক" বলিয়া নাজিমদ্দি অশ্ব হইতে নীচে নামি-লেন। অগৌণে হস্ত-পদ-বদ্ধ একটী যুবা পুরুষ তৎসমীপে

নীত হইল। যুবক খর্ব্বকায়, তাহার বর্ণ কাল, চক্ষু দুটী ছোট ছোট। তাহাকে সম্মুখে উপস্থিত করার অব্যবহিত পরেই নাজিমদ্দি বলিয়া উঠিলেন "তোকে আমি বেশ চিনি, তোর নামই না কানাইলাল?

কানাই। আমারই নাম কানাইলাল।

নাজিমদ্দি। এখন ও দিকে কোথায় যাইতেছিলি?

কানাই। মহারাজা মাণিক লালের রাজধানী কণকপুরে।

নাজিমদ্দি। কাহার আদেশে?

কানাই। সম্রাটের আদেশে।

নাজিমদ্দি। কেন?

কানাই। আমাকে মাপ করিবেন, উহা অন্যের নিকটে বলিতে আমার অধিকার নাই।

নাজিমদ্দি। এ বার তুই আমার হাতে পড়েছিস, না বলিয়া নিস্তার নাই, যদি অবিলম্বে যথার্থ উত্তর না পাই, তবে এই অসি দ্বারা তোর ঐ শরীর খণ্ড খণ্ড করিতে কুণ্ঠিত হইব না।

কানাই। এখন অপনার হাতে পড়িয়াছি, যাহা করেন তাহাই শোভা পায়।

নাজিমদ্দি। তুই উত্তর দিতে কুণ্ঠিত কেন?

কানাই। সংবাদ গোপনীয়।

নাজিমদ্দি। গোপনীয়ই হউক আর যাহাই হউক, আমাকে এখনি বলিতে হইবে, নচেৎ তোকে এখনি যমালয়ে পাঠাইব।

কানাই। ভাল, তাহাই হউক, আমি অবিশ্বাসী হইতে পারিব না।

নাজিমদ্দির আর সহ্য হইল না, তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, অনতিবিলম্বে শাণিত কৃপাণ

ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। শ্রেণীবদ্ধ অশ্বারোহী পুরুষদিগের মধ্য হইতে বসুরদ্দি এ সমস্ত দেখিতেছিল। যখন দেখিতে পাইল নাজিমদ্দির কৃপাণ ঝকমকিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, অমনি ঝম্প প্রদানে পশ্চাৎ হইতে ঊর্দ্ধ্বস্থিত কৃপাণের গতিরোধ করিয়া বলিলেন—"তাহা হইবে না, আমি জীবিত থাকিতে ইহার মৃত্যু দেখিতে পারিব না। এ আমার জীবন-দাতা, অগ্রে আমার মস্তক দ্বিখণ্ডিত হউক, পশ্চাৎ ইহাকে বিনাশ করিতে হয় করিবেন।

নাজিমদ্দি। এ তোমার জীবনদাতা!—ভাল, তোমার অভীষ্টসিদ্ধি হউক, আমি ইহাকে প্রাণে বধ করিব না।

বসুরদ্দি। আপনার দয়ায় উপকৃত হইলাম। কানাইলাল সম্রাট-বিদ্বেষী; তাহাদ্বারা বিশেষ কোন উপকারের সম্ভাবনা আছে। কানাই অবিশ্বাসী হওয়া মহাপাপ বিবেচনা করে, সুতরাং যত দিন সম্রাটের বেতন ভোগী থাকিবে তত দিন তাহার অনিষ্টে দাঁড়াইতে ইচ্ছুক নহে; কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পরেই তাহাকে সম্রাটের শত্রু বলিয়া মনে করিবেন; কারণ সম্রাট কোন বিষয়ে তাহার বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছে, সেও তাহার প্রতিশোধ লইতে ক্ষান্ত থাকিবে না।

এই কথা শ্রবণ করিয়া নাজিমদ্দি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন, পরে সহসা বসুরদ্দি ও কানাইলালকে সঙ্গে করিয়া কোন নিভৃত স্থানে চলিয়া গেলেন। কিয়ৎকাল পরে তাহারা কি পরামর্শ করিয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিলেন এবং অনতিবিলম্বে একটী দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক বসুরদ্দি কানাইকে সঙ্গে করিয়া দিল্লী নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইল; কোথাও আর মনুষ্যের কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। চতুর্দ্দিক্ ভূগর্ভস্থ কীট

বিশেষের ঝিল্লী রবে পরিপূর্ণ হইতেছে, এমন সময়ে বসুরুদ্দি ও কানাইলাল, দিল্লী-নগর-প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। সহসা কোন বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইতে পারে, এই ভাবিয়া আতঙ্কে তাঁহারা অস্থির হইতে লাগিলেন। কিন্তু সে আতঙ্কে তাঁহাদিগকে অধিকক্ষণ ব্যাকুল করিতে পারিল না। তাঁহারা দৃঢ়মনা হইয়া কর্ত্তব্য সাধনে যত্নপর হইলেন। নাজিমদ্দি ও তাঁহার অধীনস্থ দুই শত অশ্বারোহী পুরুষ তাঁহাদিগের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা নগরের বহির্দ্বারে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, একটী প্রহরীর শরীর দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে, অন্যটী অর্দ্ধ-মুমূর্ষাবস্থায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। নাজিমদ্দি অবিলম্বে নগরে প্রবেশ করিলেন এবং অনতিদূরস্থ দুর্গের দিকে অতি সাবধানে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ তাঁহার অনুধাবন করিতে লাগিল।

এমন সময়ে কে তোমরা ঐ প্রাসাদোপরি সুসজ্জিত ত্রিতল গৃহে বসিয়া বসিয়া হেলিতেছ, ঢুলিতেছ এবং আরক্তিম নয়নে এক একবার এক দৃষ্টে লক্ষ্যপ্রতি চাহিতে চেষ্টা করিতেছ? আর কে তুমি সভামণ্ডপ অলঙ্কৃত করতঃ ঐ সুমধুর সঙ্গীতরসে মন ঢালিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছ? চিনিয়াছি, তোমরাই সম্রাটের পারিষদবর্গ, আর তুমিই সেই সম্রাট। সম্রাটের প্রাসাদে আজ গান হইতেছিল; সম্রাট পারিষদগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া তাহাই শুনিতেছিলেন; অন্যদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, অন্য বিষয়ে তাঁহাদের মন নাই; তাঁহাদের নয়ন একলক্ষ্যে বদ্ধ ছিল, তাঁহাদের মনও এক ভাবেই নির্লিপ্ত ছিল। নর্ত্তকী নাচিতেছিল, গাইতেছিল, ঢুলিয়া ঢুলিয়া হাবভাবে মন বিচলিত করিতে চেষ্টা পাইতেছিল; তাঁহারাও শুনিতেছিলেন, তালে তালে দুলিতেছিলেন ও অর্দ্ধ-উন্মাদাবস্থায়

অট্টহাসি হাসিতেছিলেন। এমন সময়ে অনতিদূরে একটী বিকট শব্দ হইল। কেহই তাহা লক্ষ্য করিলেন না; নর্ত্তকী গাইতে লাগিল।

ধন জন যৌবন সব চলি যায় রে! তাহারাও মনে মনে ভাবিতে লাগিল "সব চলি যায় রে।" সম্রাট সুরাপানে বিভোর হইয়াছিলেন, অমনি উচৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "তবে কি হবে উপায় রে!" নর্ত্তকী গাইতে লাগিল—

থাকিতে সময় তায় ভোগ করি লও রে।

অমনি সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"ভোগ করি লও রে।" সেই শব্দ সহ মিশিয়া অনতিদূরে ভয়ঙ্কর স্বরে গর্জ্জিয়া উঠিল—"হুসেন আলীকো জয়, নাজিমদ্দিকো জয়।" সঙ্গীত থামিয়া গেল, যন্ত্রীর যন্ত্র নীরব হইল, আতঙ্কে নর্ত্তকীর করস্থিত রুমাল স্খলিত লইয়া ভূতলে পড়িল। ক্রমে শব্দ বাড়িতে লাগিল, অস্ত্রের ঝঞ্চনা নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সম্রাট এতক্ষণ অন্তরে ঘুমাইতেছিলেন, শব্দ ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছে শুনিয়া অমনি লম্ফ প্রদানে আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন শত্রুগণ দলবলে তাঁহাদিগের দিকে আসিতেছে। দেখিয়াই তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল, পারিষদবর্গ শশব্যস্তে এদিক্ ওদিক্ ছুটিতে লাগিল। কেহ ধৃত হইয়া শৃঙ্খল-বদ্ধ হইল, কেহ বা পালাইয়া রক্ষা পাইল। সম্রাট নিরুপায় দেখিয়া প্রাণভয়ে পলায়নপর হইলেন, বিপক্ষেরাও তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। অতি কষ্টে সম্রাট এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন। নাজিমদ্দি অনেক ক্ষণ অন্বেষণ করিয়াও সম্রাটের কোন উদ্দেশ পাইলেন না, অবশেষে হতাশবান হইয়া তথা হইতে দলবলে স্বস্থানাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় যাহা কিছু পাইলেন, সমস্ত সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আজ নবাব-বাড়ীতে বড় ধুম। হুসেন আলীর মনে আনন্দ ধরে না। কাল তাঁহার কন্যার বিবাহ; চারি দিকে পথ ঘাট সমস্ত নানাবিধ পুষ্পপত্রে সজ্জিত হইয়াছে; চতুর্দ্দিক যেন ধব্ ধব্ করিয়া জ্বলিতেছে; কোথাও নৃত্যকী নাচিতেছে, গায়কী গাই-তেছে; কোথাও বা সুমধুর তানে শ্রবণরঞ্জন নানাবিধ বাজনা বাজিতেছে। আজ সমস্ত স্থান লোক-পরিপূর্ণ; ছেলেরা দলে দলে চলিতেছে, দৌড়িতেছে, খেলিতেছে ও মাঝে মাঝে সকলে সমস্বরে আনন্দধ্বনি আকাশে উঠাইতেছে। বৃদ্ধগণ যষ্টিভরে চলিতেছে, যুবকগণ তাম্বুল চর্ব্বণে মুখ লাল করিয়া দল দলে এদিক ওদিক ছুটিতেছে; কেহ নবাব-তনয়ার রূপের প্রশংসা করিতেছে, কেহ মিঞাজানের প্রশংসা করিতেছে, কেহবা তাঁহাকে শতবার নিন্দা করিতে করিতে চলিতেছে। কোন পরশ্রী-কাতর যুবক মিঞাজানের স্বভাবে ও সৌন্দর্য্যে ধিক্কার প্রদান করিয়া, তাঁহার পরিবর্ত্তে নবাব-পুত্রীকে লাভ করিবার জন্য সেই যে অপেক্ষাকৃত অধিক উপযুক্ত ইহা প্রমাণ করাইয়া দিতে লাগিল। এবং পরক্ষণেই নবাব-তনয়ার রূপের নিন্দা করিয়া বলিয়া উঠিল "আমাকে সাধিয়া দিলেও এখন আমি অগ্রাহ্য করি।" আর এক দল বেশ ভুষায় সজ্জিত হইয়া মিঞাজানের নিকট আপনাদের সন্তোষ প্রকাশ করিবে বলিয়া তাঁহার নিকট চলিল। আর মিঞাজান? ঐ দেখ তাঁহার আকৃতির কত দূর পরিবর্ত্তন। তাঁহার ললাটদেশ চিন্তা-রেখায় অঙ্কিত হই-য়াছে। কত লোক তাঁহার অভিবাদনার্থ আসিতেছে, যাই-তেছে, তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না; গম্ভীর-

ভাবে এক স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। আজ তাঁহার মনের এক নূতন পরিবর্ত্তন, এরূপ ভাব তাঁহার মনে কখনও উপস্থিত হয় নাই ; এরূপ চিন্তায় তাঁহাকে কখনও জর্জ্জরিত করে নাই। যুবকগণ বদ্‌রসিক ভাবিয়া মনে মনে শত নিন্দা করিতে করিতে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিল ; বৃদ্ধগণ তাঁহার মলিনতার কারণ না বুঝিতে পারিয়া একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল। মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত যাইতে লাগিল, মিঞাজানের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এবং মানসিক সুস্থতাও যেন তৎসহ মিশ্রিত হইয়াই অস্তমিত হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার মন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল ; তিনি সে কামরা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন ও শয্যায় শয়িত হইয়া নিমীলিত-নয়নে ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিযুক্ত রহিলেন। এমন সময়ে একটী অশ্বারোহী পুরুষ ত্রস্তগমনে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া মিঞাজান সমীপে একখানা পত্র প্রদান করিলেন। মিঞাজান পত্র পাইয়া উঠিয়া বসিলেন ; তাঁহার মন প্রফুল্ল হইল, মুখমণ্ডল বিকসিত হইল, তিনি সত্বর তাঁহার প্রিয় সুহৃদ রহিমের নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন। রহিম নিকটস্থ অন্য কামরায় বসিয়া বয়স্যের অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের কথা ভাবিতেছিলেন, লোক উপস্থিত হওয়া মাত্র তিনি অগৌণে মিঞাজান সমীপে উপস্থিত হইলেন। মিঞাজান মনের ভাব গোপনে রাখিয়া রহিমকে কহিলেন "রহিম! তুমি হয় ত আমার মানসিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া মনে মনে ভাবিতেছিলে ; বাস্তবিক ভাবনার কোন কারণ নাই ; বিবাহ আহ্লাদের কাজ, ইহাতে বন্ধু বান্ধব সমস্ত উপস্থিত থাকিলে যতদূর আনন্দ হয় এমন আর কিছুতেই নয়। আমি ভাবিয়াছিলাম এমন সময়ে আমার প্রিয় বন্ধু নাজিমদ্দি উপস্থিত থাকিবেন না,

এবং সেই ভাবনাতেই বিমর্ষ হইয়াছিলাম ; কিন্তু এই দেখ তাঁহার পত্র, তিনি এখন কাঞ্চনপুরে অবস্থিতি করিতেছেন, আমি মুহূর্ত্তে যাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পুর্ব্বক লইয়া আসিব।

রহিম। তোমার কার্য্যের ভার আমাকে অর্পণ কর, আমি যাইয়া তাঁহাকে সসমাদরে লইয়া আসি।

রহিম নাজ্জিমদ্দির পত্র পড়িয়াছিলেন এবং তাহাতে তাঁহার মনে এক বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল ; তিনি মিঞাজানের একাকী যাইয়া নাজিমদ্দির সহিত সাক্ষাৎ করা দূষনীয় বিবে-চনায়ই ঐ রূপ বলিলেন। মিঞাজান বলিলেন "তাহা হইবে না, আমিই যাইব।"

রহিম। তবে চল, আমিও যাইব।

মিঞাজান। তুমি যাইবে কেন? আমি একাকী যাইব৷

রহিম অনেক ক্ষণ চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মত খণ্ডাইতে পারিলেন না ; অবশেষে বলিলেন "ভাল যাও, কিন্তু আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবে।"

"তাহাই হইবে" বলিয়া মিঞাজান চলিলেন, এবং কতকদূর যাইয়াই পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন ও রহিমের হাত ধরিয়া বলিলেন—"বয়স্য! আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে।"

রহিম। কি অনুরোধ?

মিঞাজান। আমার সেই প্রতিজ্ঞা যে প্রকারে রক্ষা পায় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিও। আমি যখন ফিরিয়া আসিব তখন আর কাহারও সহিত আলাপ করিব না, কাহাকে মুখও দেখাইব না। আমার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকিবে, বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে কেহ দেখিতে পাইবে না, আমি সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রে আচ্ছাদিত রাখিয়া মৌনব্রতে আসিব।

রহিম। সে কথা ত সে দিনই স্থির হইয়া গিয়াছে? নবাব তোমার কোন্ কার্য্যে অমত প্রকাশ করিয়াছেন? তোমার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালিত হইবে; অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমিও তোমাকে স্পর্শ করিব না।

মিঞাজান। তবে এখন বিদায় হই।

রহিম। নবাবের বিনানুমতিতে তোমার নগরের বাহিরে যাওয়ার হুকুম নাই; কি রূপে যাইবে?

মিঞাজান একটী অঙ্গুরীয়ক দেখাইলেন। রহিম তাহাতে নাজিমদ্দির খোদিত নাম দেখিয়া আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। মিঞাজানও আর বিলম্ব না করিয়া অশ্বারোহণে গন্তব্য পথাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, অশ্বারোহী পুরুষ তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিল।

ক্রমে তাঁহারা রাজপথ অতিক্রম করিয়া একটী অপ্রশস্ত পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। কতকদূর যাইয়া বসুরদ্দির সহিত সাক্ষাৎ হইল। বসুরদ্দি অশ্বারোহণে কোথায় যাইতেছিল; মিঞাজানকে দেখিতে পাইয়া অশ্বের বেগ সংযত করিল এবং মিঞাজানকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া অন্য একটী রাস্তা অবলম্বনে এক অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিল। অশ্বারোহী পুরুষ ঐ স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে তাঁহারা এক নিবিড় স্থানে উপস্থিত হইলেন; তথায় নাজিমদ্দি অপেক্ষা করিতেছিলেন, মিঞাজান তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সত্বর অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন ও সসমাদরে অভিবাদনপূর্ব্বক কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

কিয়ৎকাল অন্যান্য আলাপের পর নাজিমদ্দি মনের ভাব গোপন করিয়া হাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বিবাহ উপস্থিত, সময়ে না আসিলে হয় ত জানিতেও পারিতাম না।"

মিঞাজান কহিলেন—"তুমি এখনও আমার মানসিক অভিসন্ধি জানিতে পারিলে না, আমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা বিফল হইবার নয়।"

নাজিমদ্দি। কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছ?

মিঞাজান। আমি বিবাহ করিব না।

নাজিমদ্দি। কেন?

মিঞাজান। তোমার জন্য; তোমাকে এই স্থানে বিবাহ করাইলে মনে যত সুখ পাইব এমন আর কিছুতেই নয়।

নাজিমদ্দি। আমার জন্য নিজের সুখে কণ্টক দিবে কেন?

মিঞাজান। আমার সুখ কিসে?

নাজিমদ্দি। বিবাহে।

মিঞাজান। কখনও নয়।

নাজিমদ্দি একটু হাসিলেন, মিঞাজান সেই হাসির যথার্থ অর্থ বুঝিলেন না। নাজিমদ্দি মনে মনে ভাবিলেন "আমি উপস্থিত না হইলে তো বেশ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে," এবং সেই সময়েই প্রকাশ্যে বলিলেন "ভাল, এখন প্রতিজ্ঞা রক্ষার কি উপায় করিয়াছ?

মিঞাজান। তুমি আমার বস্ত্রে সর্ব্ব শরীর ও মুখ আচ্ছাদন করিয়া রহিমের নিকট উপস্থিত হইবে, এবং বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বনে থাকিবে; কেহ তোমাকে স্পর্শও করিবে না।

সেই সময়েই মিঞাজান নিজ বস্ত্র ত্যাগ করিলেন ও সেই বস্ত্র দ্বারা নাজিমদ্দির সর্ব্ব শরীর আচ্ছাদন করিয়া দেখিতে লাগিলেন কিরূপ দেখায়। কিয়ৎকাল অবলোকনের পর হৃষ্টচিত্তে বলিলেন "বেশ হয়েছে, তোমাকে একেবারেই চিনিতে পারা যায় না।"

নাজিমদ্দি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি না আসিলে এ পোষাক কাহাকে পরাইতে?"

মিঞাজান ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "কেন, আমিই পরিয়া জামাই সাজিতাম ?"

নাজিমদ্দি এতক্ষণ অতি কষ্টে মনের প্রকৃত ভাব গোপন রাখিয়াছিলেন, এখন আর পারিলেন না ; মিঞাজানের শেষ কথা তাঁহার হৃদয়ে বড় বাজিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমারও ইচ্ছা হয় তোমাকে একবার জামাইএর সাজ সাজাই" এবং তৎক্ষণাৎ জনৈক সেনানীর প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। অমনি পশ্চাৎ হইতে কুঠারাঘাতে ছিন্ন হইয়া মিঞাজানের মস্তক ভুমিতে পড়িল।

নৃশংস, পামর, নরহন্তা নাজিমদ্দি কি করিলি ? যে তোর জন্য সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত ছিল, তোকে প্রাণের সমান দেখিত ; যে তোর সুখে সুখী হইত, তোর দুঃখে দুঃখ বোধ করিত, আজ তুইই তাহার প্রাণহন্তা হইলি ? সে তোকে কত ভাল বাসিত, তোর সহিত সরল ভাবে কত আলাপ করিত, তাহার সরলতায় মুগ্ধ হইয়া তুইও এক দিন তাহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলি ও প্রাণের সমান ভাল বাসিয়াছিলি, তোর সেই ভাল বাসা এখন কোথায় গেল ? সেই সৌহার্দ্দ এখন কোথায় রহিল ? যাহার জন্য আজ মিঞাজানের প্রাণ বধ করিলি, সে তোকে কি মনে করিবে ? ধন্য তোর স্বভাব! ধন্য তোর জিঘাংসা-প্রবৃত্তি! অতঃপর কে আর তোকে বিশ্বাস করিতে সাহসী হইবে ?

সময় যাইতে লাগিল, নাজিমদ্দি বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন "এখন কি করিব ? কি প্রকারে রেজিয়াকে নিরুপদ্রবে লাভ করিতে পারিব ?" ক্ষণকাল চিন্তার পর তিনি স্থির করিলেন মিঞাজানের কথানুসারেই চলিবেন, তিনি তাহার উপদেশ অনুসরণ করাকেই মনস্কাম সিদ্ধির প্রশস্ত উপায় বলিয়া

অনুমান করিলেন এবং অনতিবিলম্বে বন্ধুরদ্দিকে সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহণে মিঞাজানের আবাসস্থানাভিমুখে প্রস্থান কবিলেন।

এ দিকে ক্রমে আনন্দলহরী বাড়িতে লাগিল; রাত্রি উপস্থিত প্রায়, তথাপি লোকের অভাব নাই, এক আসিতেছে, অন্য যাইতেছে। ক্রমে নগর আলোক মালায় সজ্জিত হইয়া উঠিল। নর্ত্তকী নুতন উৎসাহে নাচিতে লাগিল; গায়ক গায়কীগণ পরমানন্দে মধুর স্বরে গান করিতে লাগিল,—নগর আনন্দময়। আনন্দের সময় আর. কতক্ষণ থাকিবে? দেখিতে দেখিতে সময় চলিয়া গেল; ক্রমে বিবাহের সময় উপস্থিত হইল, রেজিয়া সমস্ত বিষয় অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি বিবাহ সম্বন্ধে কোন অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না; নিরুপদ্রবে বিবাহ কার্য্য সমাধা হইয়া গেল।

বিবাহের পর যাহা ঘটিল, তাহাতে সকলেই স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল; নবাবের আনন্দ সহসা নিরানন্দে পরিণত হইল; রহিম এতক্ষণ যে আনন্দে ভাসিতেছিলেন তাঁহার সে আনন্দে বজ্রাঘাত হইল, তাঁহার মন মিঞাজানের জন্য উৎকণ্ঠিত হইল, তিনি অবিলম্বে নগর পরিত্যাগ করিয়া তদীয় অন্বেষণে বহির্গত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য।"

একদা বেলা অনুমানিক এক প্রহরের সময় রামপুরা গ্রামের তিন ক্রোশ পূর্ব্বস্থ এক নিবিড় কাননে বসিয়া বসিয়া একটী স্ত্রীলোক গান গাইতেছিল। তাহার হস্তে একখানা কুঠার ছিল এবং বক্ষদেশে পত্র-রচিত এক ছড়া মালা দুলিতেছিল। তাহার বসন মলিন ও জীর্ণ। তাহাকে দেখিলে সহজেই উন্মাদগ্রস্থা বলিয়া অনুমান হয়, বস্তুতঃও সে উন্মাদগ্রস্থাই ছিল। পাঠক! এ উন্মাদিনীকে চিনিলে? এ আমাদের অনেক দিনের পরিচিত সেই পাগ্‌লী।

পাগ্‌লী একবার হাসিতেছিল, একবার কাঁদিতেছিল, একবার মনের আনন্দে গাইতেছিল; কোন্ ভাবের কি গাইতেছিল তাহা সেই বলিতে পারে, অন্যের জানিবার সাধ্য নাই। তাহার কণ্ঠ-ধ্বনি নিবিড় অরণ্যানিতে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল কিন্তু পশু পক্ষী ভিন্ন অন্য কেহ তাহা শুনিবার ছিল না। কে বলে পাগল্ অসুখী? কে বলে পাগল নির্ব্বোধ, অজ্ঞান? পাগলের মনে অনন্ত সুখ, অনন্ত জ্ঞান। পাগল সুখে হাসে, সুখে গায়, সুখে যদৃচ্ছাক্রমে বেড়িয়া বেড়ায়; তাহার পদরেণু স্পর্শে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করি। তুমি পাপের ভৃত্য, দুঃখের আশ্রয়স্থান, তুমি কি রূপে পাগলের জ্ঞান, পাগলের বুদ্ধি বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হইবে? পাগলের অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত বুদ্ধি! যাহার লোষ্ট্র কাঞ্চনে সমজ্ঞান, যাহার মিত্রে অমিত্রে সমস্নেহ, যে পুণ্যের ধারে যায় না,

পাপের অসহ্য কণ্ডূয়নেও বিপথগামী হয় না, তাহাকে জ্ঞানী না বলিয়া কাহাকে বলিব? সেই অনন্তযোগী, পরমপুরুষ। ইচ্ছা হয় আমরণ কাল তাহার সঙ্গী হইয়া তাহার ন্যায় নিরুদ্বেগে কাল যাপন করি।

গান শেষ হইলে পাগলিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে একটী কুক্কুর শয়ন করিয়াছিল, পাগলিনী দৌড়িয়া গিয়া তাহাব গলা জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল—"কুকুর! তুই আমার সঙ্গে এসেছিস্? বেশ হয়েছে। আয় তোকে মালা পরিয়ে দি।" পাগলিনী নিজের কণ্ঠহার কুকুরকে পরাইয়া হাত তালি দিয়া হাসিতে লাগিল, তাহার সেই হাসি অন্য কেহ দেখিল না, সবে মাত্র কুকুরই দেখিতে পাইল। পাগলিনী অনেক দিন হইতে এই কুকুরটীকে যত্ন করিত; কুকুরও সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। হাসি শেষ হইলে পাগলিনী অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সম্মুখে একটী পুকুর ছিল, পাগলিনী জল দেখিলেই স্নান করিতে ভাল বাসিত, এ পুকুরেও স্নান করিতে নামিল, কুকুর দাঁড়াইয়া রহিল। পাগলিনী এবার গান ধরিল। গাইতে গাইতে পুকুরের কর্দ্দমে শরীর লেপিতে লাগিল। লেপন শেষ হইলে কতকগুলি কর্দ্দম তুলিয়া হস্তে লইয়া পুনরায় অরণ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সম্মুখে একখানা পর্ণ কুটীর শোভিতেছিল, ঐ জন-হীন অঘোর অরণ্যে উহাই একমাত্র কুটীর। এ কুটীরে দুটী লোক থাকিত, একটী বৃদ্ধ, অন্যটী যুবতী। ইহাদিগকে চিনিতে পারিলে? ঐ যে বৃদ্ধ দেখিতেছ ইনি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত শশিভূষণ, আর ঐ যে যুবতী দেখিতেছ, ইনিও আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত সেই বালিকা। কালের কঠোর শাসনে যুবক বৃদ্ধ হইয়াছে, বালিকা যুবতী সাজিয়াছে। যুবতীর বয়ঃক্রম অষ্টাদশ, বর্ণ উত্তম শ্যাম,

দেখিতে সুশ্রী। আজ হইতে আমরা ইহাকে 'অবলা' নামে ডাকিব। অবলা শশিভূষণকে চিনিতেন না; শশিভূষণ অবলাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, অথচ তাহার নিকট আত্ম পরিচয় গোপনে রাখিতেন। অবলা অরণ্যে প্রতিপালিতা হইয়াছিল, সংসারের কোন খবর রাখিত না, সংসারের কুটিলতা তাহার মধ্যে প্রবেশ পাইয়াছিল না, তাহাতে সরলতা ওতপ্রোত ভাবে বিরাজিত ছিল। পাগলিনী প্রায়ই অবলার নিকট আসিত, কেন আসিত, জানিত না। অবলা তাহাকে পাগ্‌লী মাসী বলিয়া ডাকিত, পাগলিনীও অবলাকে খুকি বলিয়া ডাকিত। অবলাকে দেখিলে পাগলিনীর বড় আনন্দ হইত, সে তাহাকে বনফুলে ও বন পাতায় সাজাইত ও মাঝে মাঝে তাহাকে লইয়া সেই অঘোর অরণ্য মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত। অবলা পাগলিনীকে বড় ভাল বাসিত, এক দিন তাহাকে না দেখিলে মনে কত কষ্ট পাইত; সেই বিজন বনে পাগলিনী ভিন্ন তাহার আর দ্বিতীয় সখী ছিল না।

অবলা শুইয়া মনে মনে কি ভাবিতেছিল, এমন সময় পাগলিনীর গান শুনিতে পাইল। অবলার মনে আনন্দ ধরিল না; অমনি শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল; পাগলিনী গান করিতে করিতে সমীপস্থ হইলে জিজ্ঞাসা করিল—"পাগ্‌লী মাসি, তুই এ দুদিন কোথায় ছিলি? আমি তোর জন্য খাবার রেখেছি, এখন খাবি?" পাগলিনী হাসিল; অবলা তাহার জন্য কয়েকটী ফল লইয়া আসিল, পাগলিনী তাহা খাইতে লাগিল।

শশিভূষণ দূরে থাকিয়া অনিমেষ লোচনে এই সমস্ত দেখিতেছিলেন; পাগলিনীকে যখনই দেখিতেন, তখনই যেন শশিভূষণের মনে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব আসিয়া উপস্থিত হইত। শশিভূষণ সেই ভাবের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে

পারিতেন না। আজ পাগলিনীর গান শুনিয়া তাঁহার ছোট-বেলার কথা মনে পড়িল; শশিভূষণ মনে মনে ভাবিতেছিলেন "এ গান কি কোন দিন শুনিয়াছি? কেন ঐ যে বাড়ী থাকিতে এগান কত দিন শুনিতে পাইতাম, এ গান পাগলিনী কোথায় শিখিল? যে এ গান গাইত সে অনেক দিন হইল আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে; পরমেশ্বর তাহাকে শ্রীচরণে স্থান দান করুন! হায়! আমাদের সে সময় কি সুখের ছিল! সে সময় স্মরণ করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আর কি সে সময় ফিরিয়া আসিবে? তবে আর এখন সেই সমস্ত বিষয়ের পর্য্যালোচনায় কি হইবে? গতানুশোচনায় ফল নাই। আর সে সমস্ত মনে স্থান দিব না, আর তাহাদের কথা ক্ষণকাল তরেও চিন্তা করিব না। তাহারা আমার কে ছিল? তাহাদের কথা ভাবিব কেন? অখিল সংসার মায়াময়। তাহারাও মায়ার পুতুল ছিল, আমিও মায়ার পুতুল ছিলাম। কুহকিনী মায়ার মোহন যন্ত্রে পড়িয়া এত দিন তালে তালে নাচিয়াছি, আর তাহার কুহক-জালে বদ্ধ হইব না, আর তাহাদের কথা ভাবিব না; পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমার অন্তঃকরণে শান্তি প্রদান করুন।"

আহার শেষ হইলে পাগলিনী হাত খানা অবলার শরীরে পুঁছিয়া লইল এবং হাসিতে হাসিতে বলিল "খুকি! আয় তোকে সাজিয়ে দি।"

অবলা। কি দিয়ে সাজাবি?

পাগলিনী। কেন এই দেখ্ গঙ্গামাটী এনেছি, আর এক ছড়া মালা এনেছি, পর্‌বি?

অবলা। পর্‌ব।

পাগলিনী কুকুরের গলদেশ হইতে মালা গাছি লইয়া অবলার

কণ্ঠে পরাইয়া দিল, অবলা হাসিতে লাগিল। পাগলিনী এবার গম্ভীর হইয়া বসিল এবং অবলার মস্তক নিজ জানুর উপর রক্ষা করিয়া অনিমেষ নয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে একবার হাসিল, একবার কাঁদিল। সে হাসি কেহ দেখিতে পাইল না, সে কান্না কেহ শুনিতে পাইল না। ক্ষণকাল পরে অবলা উঠিয়া বসিল, পাগলিনী বলিল "খুকি! ঘোড়া দেখ্‌বি ?"

অবলা। দেখ্‌ব।

"চল্‌ তবে" বলিয়া পাগলিনী ছুটিল, অবলা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ক্রমে ক্রমে অনেক পথ অতিক্রম করিয়া পাগলিনী একটী বক্র পথ অবলম্বন করিল, এবং অনতিবিলম্বে একটী অনতিবৃহৎ দীর্ঘিকাতটে আসিয়া উপস্থিত হইল। দীর্ঘিকার জল নির্ম্মল, তীরস্থিত বৃক্ষের প্রতিবিম্ব তাহাতে প্রতিফলিত হইতেছিল। উহার চতুঃপার্শ্ব বড় বড় বৃক্ষে বেষ্টিত ছিল, এবং সেই বৃক্ষের ডালে বসিয়া পক্ষীগণ মধুর কণ্ঠে কূজন করিত। অবতরণের জন্য দীর্ঘিকায় শানবাঁধান একটী ঘাট ছিল; পাগলিনী আসিয়া মাঝে মাঝে সেই দীর্ঘিকার জলে স্নান করিত ও সেই ঘাটে বসিয়া মনের আনন্দে গান করিত। জল দেখিয়া পাগলিনী ঘোড়ার কথা ভুলিয়া গেল এবং জলে নামিবার জন্য অবলাকে সজোরে আকর্ষণ করিতে লাগিল। অবলা কিছুতেই নামিবে না দেখিয়া, পাগলিনী একাকী জলে নামিয়া ডুব দিতে লাগিল; অবলা জিজ্ঞাসা করিল "পাগ্‌লী, ঘোড়া কোথায় ?" পাগলিনী ডুব দিতেছিল, শুনিতে পাইল না। অবলা পুনরপি জিজ্ঞাসিল "পাগ্‌লী, ঘোড়া দেখ্‌ধি নে?"

কিয়ৎ দূরে দাঁড়াইয়া একটী যুবক এই সমস্ত দেখিতেছিলেন। যুবকের বয়স দ্বাবিংশ, বর্ণ গৌর, দেখিতে সুন্দর, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কবচে আচ্ছাদিত। যুবক অশ্বারোহণে কোথায় যাইতেছিলেন।

পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ঐ স্থানে শ্রম বিনোদন করিতেছিলেন; তাঁহার অশ্ব অনতিদূরে একটী গাছে বাঁধা রহিয়াছিল, পাগলিনী যাইবার সময় সেই অশ্ব দেখিয়া যায়, এবং তাহাই দেখাইবার জন্য অবলাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে। যখন অবলা শেষ বার জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন উত্তর পাইল না, তখন আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া বনের দিকে ফিরিল। কতকদূর যাইয়া মনে মনে স্থির করিল গোপন ভাবে থাকিয়া পাগলিনীকে ফাঁকি দিবে, এবং তদভিপ্রায়ে যাইবার সময়ে বলিল "পাগ্‌লী তবে আমি যাই।"

ঠিক্ সেই সময়ে পশ্চাৎ হইতে অর্দ্ধোক্তে উচ্চারিত হইল—"কোথায় যাও?" অবলা ফিরিল, ফিরিয়া দেখিতে পাইল একটী যুবক নিকটস্থ একটী বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহার পানে তাকাইতেছে। দেখিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু অনেক ক্ষণ চাহিতে পারিল না, তাহার চক্ষু আপনা হইতেই নীচে নামিল। যুবক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় যাইবে?" অবলা খুঁজিয়া কোন উত্তর পাইল না, যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিল। বলিল "ঘোড়া দেখ্‌তে যাব।" যুবক বলিলেন "আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে ঘোড়া দেখাইবে।" যুবক চলিলেন, অবলা তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। কিয়ৎদূরে যাইয়া যুবক অশ্ব সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "এই দখ ঘোড়া।"

অবলা ঘোড়ার দিকে একবার চাহিল, আর চাহিতে ইচ্ছা হইল না; নয়ন ফিরাইয়া অন্য দিকে তাকাইতে চেষ্টা করিল, অন্য দিকেও অধিক ক্ষণ তাকাইতে পারিল না, নয়ন ঘুরিরা ফিরিয়া সেই যুবকের দিকেই আকৃষ্ট হইল; যুবক কি ভাবিতে ভাবিতে একটী পত্র হস্তে লইয়া ছিঁড়িতেছিলেন, তাঁহার দৃষ্টি

নিম্ন দিকে ছিল, অবলা এই সুযোগে তাঁহাকে একবার নয়ন ভরে দেখিতে লাগিল। যে রূপ দেখিতে লাগিল তাহাতে তাহার মন মোহিত হইয়া গেল, তাহার চক্ষু তাঁহারই দিকে বদ্ধ হইয়া রহিল, অন্য দিকে ফিরিল না। যুবক চাহিয়া দেখি-লেন অবলা তাঁহাকেই দেখিতেছে, দেখিয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসিলেন "এ ঘোর অরণ্যে তুমি কি প্রকারে আসিলে ?"

অবলা কতক ক্ষণ লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া রহিল, কিছুই উত্তর করিতে পারিল না। উত্তর না করিয়াও থাকিতে পারিল না। অবশেষে আস্তে ব্যাস্তে অতিকষ্টে বলিল "জানি না।"

যুবক। ও স্ত্রীলোকটী তোমার কে হয় ?

অবলা। জানি না, আমি উহাকে পাগ্‌লী মাসী বলিয়া ডাকি।

যুবক। তুমি এস্থানে কতদিন আছ ?

অবলা। আশৈশব হইতে।

যুবক। তোমারা কি জাত ?

অবলা। শুনিয়াছি ব্রাহ্মণ।

যুবক। তুমি কাহার নিকট থাক ? কতজনে এখানে আছ ?

অবলা। আমি বাবার নিকট থাকি, আমরা দুই জনেই এখানে আছি, পাগলিনী মাঝে মাঝে আসিয়া আমার নিকট থাকে।

অবলা শশিভূষণকে ছোট সময় হইতেই "বাবা" বলিয়া ডাকিত। বস্তুতঃ তাহার সহিত কি সম্পর্ক, অথবা কোন সম্পর্ক ছিল কি না, কিছুই জানিত না। যুবক এতক্ষণে মনে মনে কি চিন্তা করিতেছিলেন, সেই চিন্তায় তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার আকৃতি দর্শনে অবলা বুঝিলেন, তিনি কোন

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, মনে করিতেছেন ; অথচ তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। যুবকের এ অবস্থা অধিক সময় স্থায়ী হইল না ; তিনি নীচের দিকে চাহিয়া অর্দ্ধোক্তে অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার বিয়ে হয়েছে ?"

অবলা এবার কোন উত্তর দিতে পারিল না। তাহার বদন মণ্ডল রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিয়া আপনা আপনি নীচু হইয়া পড়িল। যদিও সংসারের কুটিল গতি অবলার মধ্যে প্রবেশ লাভ না করিয়া থাকুক, তথাপি শশিভূষণ ও পাগলিনী হইতে যত দূর শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতেই সংসার সম্বন্ধে তাহার একটু সুন্দর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। শশিভূষণ সরল মনে তাহাকে যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিতেন, অবলা অবহিত চিত্তে তাহা শিখিয়া লইত। বিবাহ কাহাকে বলে, অবলা তাহা জানিত, সুতরাং যুবকের প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিল না, লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া রহিল। যুবক বেশ ভূষায় ও আকারে প্রকারে এক প্রকার যথার্থ উত্তর বুঝিয়া লইলেন, তথাপি সন্দেহ ভঞ্জনার্থ পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন। অবলা স্ত্রীজনোচিত লজ্জার অনুরোধে মুখে কিছু ব্যক্ত করিতে পারিল না, আস্তে ব্যস্তে মাথা নাড়িয়া যুবকের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিল।

পাগলিনী এতক্ষণ ডুব দিতেছিল, উঠিয়া দেখিল অবলা নাই, অমনি কুটীরাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিল ; কিছু দূর যাইয়া দেখিতে পাইল অবলা অন্য একটী লোকের সহিত আলাপ করিতেছে। দেখিয়াই পাগলিনীর একটী গান মনে পড়িল, পাগলিনী হাসিতে হাসিতে গাইল—

"শ্যাম পুকুরতটে সই দেখনু সে শ্যাম
সই ধবল বরণে।"

পাঠক ! এ পাগলিনীকে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করিতে চাও ?

এ অর্দ্ধ-উন্মাদ, ইহার বুদ্ধি-শক্তি প্রখর, অথচ তাহা সাধারণ চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার জ্ঞান আছে, অথচ তাহা স্পষ্টতঃপ্রকাশিত নয়, তবে ইহাকে কোন্ শ্রেণীতে ভুক্ত করিবে?

পাগলিনী গাইতে গাইতে অবলার সম্মুখে আসিল, এবং তাহার হস্তে অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "কি লা খুকি! তুই—এ—অঙ্গুরীটী কোথা পেলি? অবলা নিঃশব্দে রহিল, যুবক হাসিতে হাসিতে বলিল "আমি দিয়াছি।"

শশিভুষণ অবলার অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন, যুবকের কথা শেষ হইতে না হইতেই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যুবক যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত যে আলাপ করিতে লাগিলেন, পাগলিনী তাহা শুনিতে পাইল; অবলা দূরে দাঁড়াইয়া তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না। আলাপ শেষ হইলে শশিভুষণ যুবককে সঙ্গে করিয়া কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। যুবক কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া ক্ষণ কাল চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলেন, এবং অগৌণে অশ্বারোহনেণ গন্তব্য পথাভিমুখে চলিতে লাগি-লেন। যাইবার সময়ে এক একবার মুখ ফিরাইয়া কাহাকে দেখিতে দেখিলেন। অবলা অনিমেষ নয়নে যুবককে দেখিতে ছিল, যুবক ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেল। অবলা আর সে স্থানে দাঁড়াইয়া একটী দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ কুটীরাভিমুখে চলিল, এবং যেমন কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে অমনি পিছন থেকে পাগলিনী তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। পাগলিনী হাসিতে-ছিল; অবলা জিজ্ঞাসা করিল "পাগ্লী, হাস্‌ছিস্ কেন?" পাগলিনী এবার কোন উত্তর করিল না, পূর্ব্বের মত হাসিতে লাগিল—হি হি হি!!! অবলা চুপ্ করিয়া রহিল, আর কোন প্রশ্ন করিল না, দেখিয়া পাগলিনী বলিল "খুকি! বিয়ে কর্‌বি?"

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রথম যুবক। পারিবে?

দ্বিতীয় যুবক। পারিব।

প্রথম যুবক। পারিবে?

দ্বিতীয় যুবক। পারিব।

প্রথম যুবক। পারিবে?

দ্বিতীয় যুবক। পারিব।

প্রথম যুবক। তবে যাও, এই পথ অবলম্বন কর; সম্মুখে ঐ যে একটী বড় গাছ দেখিতেছ, প্রথমে উহার তলায় যাইয়া তাহাদের কার্য্য-প্রণালী অবলোকন কর; পশ্চাৎ যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয় করিও; কিন্তু সাবধান, তুমি একাকী, তাহারা সহস্রাধিক, যদি একবার ধরিতে পারে, অমনি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিবে।

একদা দুইটী অশ্বারোহী পুরুষ মহারাজা মাণিকলালের রাজধানী কণকপুর হইতে শাহাজাবাদ প্রস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ কবচে আচ্ছাদিত ছিল। অমানিশির নৈশ আঁধারে গা লুকাইয়া, তাঁহারা অতি সাবধানে গমন করিতেছিলেন। শাহাজাবাদের প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে আসিয়াই অনতিদূরে একটী আলোক দেখিতে পাইলেন, এবং লুক্কায়িত ভাবে গাছের আড়ালে থাকিয়া অস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইলেন, তথায় আনুমানিক দুই সহস্র অশ্বারোহী পুরুষ রণবেশে সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কিয়ৎকাল পরে দেখিতে পাইলেন তাহারা সকলে উপবেশন করিল। প্রথম যুবক দ্বিতীয় যুবককে তথায় অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থান করিতে কহিয়া স্বয়ং অশ্ব হইতে

অবতরণ করিলেন এবং পদব্রজে তাহাদের নিকট যাইয়া বৃক্ষের অন্তরাল হইতে তাহাদের বিশ্রাব্ধ আলাপ শুনিতে লাগিলেন; যাহা শুনিলেন ও দেখিলেন তাহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে নৈরাশ্যের ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি আপনার দলবলের সহিত উহাদের দলবলের তুলনা করিতে লাগিলেন, সুতরাং তাহারা যে সময় যাহা কিছু বলিতেছিল, তাহা কিছুই শুনিতে পাইলেন না। কতক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন তিনিই বলিতে পারেন। পরে কি মনে করিয়া সহসা সেই স্থান হইতে অপসৃত হইয়া দ্বিতীয় যুবক সমীপে আসিতে লাগিলেন। আসিবার সময় দেখিয়া আসিলেন তাহারা সুরাপানে মত্ত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছে। অনতি-বিলম্বে তিনি দ্বিতীয় যুবক সমীপে উপস্থিত হইয়া যাহা যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, সমস্ত বর্ণনা করিয়া স্বকীয় অভিসন্ধি তৎ সমীপে প্রকাশ করিলেন। দ্বিতীয় যুবক তাঁহার সেই প্রস্তা-বনায় অনুমোদন করিলেন। সত্বর তাঁহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র উপস্থিত হইয়া আরও কি পরামর্শ করিলেন। পরামর্শ শেষ হইলে প্রথম যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন "পারিবে?"

দ্বিতীয় যুবক উত্তর করিলেন "পারিব।"

পাঠক! এ যুবকদ্বয় কে চিনিলে? ইহাঁদের একটীর নাম খগেন্দ্র, অন্যটীর নাম রামলাল। আমরা যাঁহাকে দ্বিতীয় যুবক নামে উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারই নাম খগেন্দ্র, তিনি কণকপুরা-ধিপতি মাণিক লালের পুত্র। রাম লাল খগেন্দ্রর বন্ধু ও মাণিক লালের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। আমরা অবগত আছি শাহা-জাবাদ নবাব হুসেন আলীর অধিকার-ভুক্ত ছিল, এবং মহম্মদ জানের মৃত্যুর পর, বিধুভূষণ তথাকার শাসনকর্ত্তা হইয়া

আসেন। এ পর্য্যন্ত শাহাজাবাদের শাসনকর্ত্তা হইয়া নিরুদ্বেগে কাল কাটাইতেছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ এক বিগ্রহ উপস্থিত হইল। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে মাণিক লালের সহিত হুসেন আলীর এক সন্ধি স্থাপন হয়, এবং সেই সন্ধির নিয়মানুসারে হুসেন আলী প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হন যে তিনি ভবিষ্যতে আর কোন দিন দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন না। কিন্তু তিনি অল্প কাল মধ্যেই সেই প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে কার্য্য করেন, আমরা সপ্তম পরিচ্ছেদে ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। দিল্লীর সম্রাট অনেকাংশে মাণিক লালের বাহু বলের উপর নির্ভর করিতেন। নাজিমদ্দি তাঁহার নগর লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গেলে, তিনি মাণিক লালকে সেই সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন; মাণিক লালও তাহার প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া সম্রাট সমীপে অঙ্গিকার করেন। শাহাজাবাদ মাণিক লালের অধিকারের সীমা-প্রান্তে ছিল। তিনি তাহাই অধিকার করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করেন এবং তদভিপ্রায়ে পাঁচ শত অশ্বারোহী পুরুষ সহ স্বকীয় তনয় ও রাম লালকে শাহাজাবাদ প্রেরণ করেন। খগেন্দ্র ও রাম লাল অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের উপদেশানুসারে অন্যান্য সৈন্যগণ পশ্চাৎ অপেক্ষা করিতেছিল। হুসেন আলী তাঁহাদের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্বাহ্লেই চতুর্গুণ সৈন্য সহ নাজিমদ্দিকে বিধুভুষণের সাহায্যে শাহাজাবাদ প্রেরণ করেন; পাঠক! উঁহাদেরই সহিত আমাদের অল্পক্ষণ হইল দেখা হইয়াছে। নাজিমদ্দি দলবলে বেষ্টিত হইয়া আমোদে রত ছিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে একটী মাত্র আলোক জ্বলিতেছিল। তাঁহারা ঘন পত্রাচ্ছাদিত একটী অশ্বত্থ তলায় বসিয়া শ্রম বিনোদন করিতেছিলেন। অশ্বত্থের ডাল তাঁহাদের মস্তকোপরি দুলিতেছিল। প্রায় পঁচিশ হাত অন্তর আর একটী অশ্বত্থ গাছ ছিল; তাহার

শাখা প্রশাখা ঐ অশ্বথের শাখা প্রশাখার সহিত সংলগ্ন ছিল। রাম লাল খগেন্দ্রকে এই বৃক্ষ তলাতেই আসিতে বলিয়াছিলেন; খগেন্দ্রও তাঁহার উপদেশ অনুসারে যথানির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইলে রাম লাল সশস্ত্রে অন্য একদিকে প্রস্থান করিলেন; কি মন্ত্রণা করিয়া প্রস্থান করিলেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন।

খগেন্দ্র যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন নাজিমদ্দি এবং তাঁহার সৈন্যগণ সেই দিকে পিছন দিয়া বসিয়াছিলেন, সুতরাং খগেন্দ্র বৃক্ষ তলায় উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইল না। খগেন্দ্র ক্ষণকাল বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া অস্পষ্টালোকে বৃক্ষটীর আগাগোড়া সমস্ত একবার দেখিয়া লইলেন, এবং অনতিবিলম্বে সেই বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই বৃক্ষের ডাল অবলম্বনে নাজিমদ্দি ও তাঁহার সৈন্যগণ যে বৃক্ষ-তলায় বসিয়াছিলেন সেই বৃক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অতি সাবধানতার সহিত একটী বড় ডাল বাহিয়া তাঁহাদের ঠিক মস্তকের উপর আসিলেন। সেই ডালটী মৃত্তিকা হইতে হাত পাঁচেক ঊর্দ্ধে ছিল। এ দিকে রাম লাল খগেন্দ্রের নিকট হইতে বিদায় লইয়া একটী বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া রহিলেন; তিনি অশ্ব পৃষ্ঠেই ছিলেন, খগেন্দ্রর অশ্ব অনতিদূরে একটী বৃক্ষ-তলে বাঁধা ছিল। খগেন্দ্র শিক্ষানুসারে হঠাৎ সজোরে ডাল ধরিয়া নাড়া দিলেন, গাছ সপ্ সপ্ শব্দে নড়িয়া উঠিল; অমনি সকলে গাছের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন অন্যূন দ্বাবিংশ বর্ষ বয়স্ক একটী হিন্দু যুবক গাছের উপর রহিয়াছে। নাজিমদ্দি তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিলেন এবং তৎক্ষণাৎ চীৎকার করতঃ লম্ফ প্রদানে গাছের ডাল ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন; ঠিক সেই সময়ে রাম লাল পূর্ণ বেগের সহিত মুসলমান সৈন্যের মধ্য স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত দীপ শিখা নির্ব্বাণ করতঃ সজোরে অসি

চালনা করিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহার গতির বেগবত্তায় তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইল না; তিনি অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া তাহাদিগকে ছিন্ন বিছিন্ন করিতে লাগিলেন। যবনগণ এক দুই করিয়া ধরাশায়ী হইতে লাগিল। তিনি আর অধিক কাল সেই স্থানে না থাকিয়া অনতিবিলম্বে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইলেন। সৈন্যগণ ভাবিল তাহারা বহুল বিপক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, এবং এই ভাবিয়া সকলেই স্ব স্ব প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত আকুল হইয়া যাহাকে সম্মুখে পাইতে লাগিল, বিপক্ষ জ্ঞানে তাহারই উপর অসি চালনা করিতে আরম্ভ করিল; এই রূপে তাহারা আপনারা আপনাদিকের বধ কার্য্যে নিযুক্ত হইল। এ দিকে খগেন্দ্র যে ডাল দিয়া আসিয়াছিলেন, অতি কষ্টে সেই ডাল অবলম্বনে চলিতে লাগিলেন। যাইবার সময় এক এক বার ডাল ধরিয়া নাড়া দিতে লাগিলেন। নাজিমদ্দি ও তাহার সঙ্গীগণ বৃক্ষের উপর তাঁহাকে বৃথা অন্বেষণ করিতে লাগিল; তিনি কিয়ৎদূর যাইয়া লম্ফ প্রদানে ভুমিতে পড়িলেন। অমনি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দশ বার জন সৈন্য বৃক্ষ হইতে লাফাইয়া পড়িল, কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে পারিল না; তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইয়া অশ্বে আরোহণ পুর্ব্বক কশাঘাত করিলেন। অশ্ব বায়ু বেগে ছুটিল।

বলা বাহুল্য যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হুসেন্ আলীর সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইল। নাজিমদ্দি বৃক্ষোপরে থাকিয়া এই বিষম বিভ্রাট দেখিতেছিলেন। আঁধারে কি দেখিতেছিলেন তিনিই জানেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সে সময়ে নীচে নামিলে তাঁহার অবশ্য মরণ এবং ইহা ভাবিয়াই বধকার্য্য সমাপ্তি পর্য্যন্ত তিনি বৃক্ষের উপরে রহিলেন। আর আর যাহারা গাছে উঠিয়াছিল তাহারাও ঐরূপ অপেক্ষা করিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে

অস্ত্রের ঝঞ্কনা থামিল। সৈন্যগণের চীৎকার ধ্বনি নীরব হইল এবং সমস্ত স্থান নির্জ্জন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; কতকগুলি আহত লোক ভূমে গড়াগড়ি দিতে ছিল, তাহারাই মাঝে মাঝে হৃদয়-ভেদী আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। নাজিমদ্দি আরও কিয়ৎকাল বৃক্ষে থাকিয়া, যখন আর বিপক্ষদিগের কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না; তখন বৃক্ষ হইতে ধীরে ধীরে নীচে নামিলেন। ক্ষণ কাল পরে তিনি একটী সঙ্কেতধ্বনি করিলেন, সেই ধ্বনি শুনিতে পাইয়া তাঁহার দলস্থ যে দুই এক জন লোক লুক্কায়িত ভাবে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা অবিলম্বে আসিয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইতে লাগিল। নাজিমদ্দি সমস্ত সংখ্যা গণনা করিয়া দেখিলেন, দুই সহস্র সৈন্য মধ্যে কেবল বিংশতি জন অনাহত আছে। তিনি অনতিবিলম্বে দুই জন সৈন্য দ্বারা শাহাজাবাদে সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন, এবং নিজে অষ্টাদশ জন সৈন্যসহ হুসেনপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় পাছে বিপক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হন, এই ভয়ে সাধারণের গন্তব্যপথ ত্যাগ করিয়া রামপুরার প্রায় সাত ক্রোশ পূর্ব্বস্থ নিবিড় কাননের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন। সেই অঘোর অরণ্যে অন্য লোক চলিত না। নাজিমদ্দি ভাবিল সেই আরণ্য-পথই তাহার অবলম্বনীয়।

এদিকে খগেন্দ্র ও রামলাল উভয়েই প্রায় এক সময়ে আসিয়া স্বদলে প্রবেশ করিলেন; সৈন্যগণ তাঁহাদিগের সাক্ষাৎলাভ পাইয়া এবং তাঁহাদের সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া বিপুল আনন্দে ভাসিতে লাগিল। তাঁহারাও ক্ষণকাল বিশ্রামের পর সেই রাত্রি কালেই শাহাজাবাদ আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়া নূতন উৎসাহে উৎসাহীত হইয়া পরমানন্দে সেই দিকে চলিতে লাগিলেন, মাঠ শূন্য পড়িয়া রহিল।

ইতি পূর্ব্বেই শাহাজাবাদে সমস্ত সংবাদ প্রেরিত হইয়াছিল ; বিধুভুষণ সংবাদ পাইয়া উদ্বিগ্ন-চিত্তে হেমচন্দ্রকে ডাকাইলেন। হেমের বয়স কিঞ্চিদূন অষ্টাদশ, তিনি এই অল্প সময়ের মধ্যেই শস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। হেমচন্দ্র উপস্থিত হইলে বিধুভুষণ তৎসমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন এবং ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া গোপনে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র তাহাতে কিছুতেই স্বীকার হইল না। বিধুভূষণ হেমচন্দ্রের জন্য নিতান্ত চিন্তিত ছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা ছিল, হেমচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া অনতিবিলম্বে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করেন ; কিন্তু হেমচন্দ্রের তাহাতে মত নাই দেখিয়া, অগত্যা যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন ; এবং যাহা কিছু অল্প সংখ্যক সৈন্য ছিল সমস্ত অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত করিয়া তত্রত্য দুর্গ অবলম্বন করিয়া রহিলেন। মানসিক চঞ্চলতার দরুণ আর কিছুরই সমরক্ষণের উপায় করিতে পারিলেন না। কিয়ৎকাল পরেই মাণিক লালের সমস্ত সৈন্য আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। দূর হইতে তাহাদের সংখ্যা অনুমান করিয়া বিধুভূষণ দুর্গদ্বার বন্ধ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। অনতিবিলম্বে কবাটরুদ্ধ হইল। আততায়ীগণ যে স্থানে যাহা পাইল তাহাই লুঠ করিয়া লইতে লাগিল, কেহই তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইল না। অন্যান্য সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া তাহারা সেই রাত্রিতেই দুর্গ বেষ্টন করিয়া রহিল; দুর্গস্থ কেহই তাহাদিগকে তাড়াইবার উদ্যোগ করিল না।

সময় বহিতে লাগিল, বিধুভূষণের মনে এখনও আশা যে সত্বর হুসেনপুর হইতে তাঁহার সাহায্যার্থ বহুল সেনা প্রেরিত হইবে। কিন্তু সময় অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল, কেহই আসিল না। তাঁহারা সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি দুর্গে বন্ধ রহিলেন। মনের

চঞ্চলতায় তাঁহাদের আহারীয় কিছুই দুর্গ মধ্যে সংগ্রহ করা হয় নাই, তাঁহারা সমস্ত দিন সকলেই অনশনে রহিলেন। ক্রমে তাঁহাদের বুভুক্ষার বৃদ্ধির সহিত বল বীর্য্যের হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। হেমচন্দ্র বিবেচনা করিলেন দুর্গে থাকিলেও অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। তিনি অবিলম্বে কএকটী সাহসী সেনানীর সহিত প্রস্তাব করিলেন আগামী রাত্রিতেই আততায়ীগণকে দলবলে সহসা আক্রমণ করিবেন। এবং তদনুসারে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় হঠাৎ সবলে তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু দুর্ব্বলতা ও সংখ্যার অল্পতা নিবন্ধন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পরাস্ত হইলেন। খগেন্দ্রের অনুমতি ছিল, কাহাকেও প্রাণে বিনাশ করিবে না। সৈন্যগণও সেই আজ্ঞানুযায়ী কাজ করিতে বিস্মৃত হইল না; অনতিবিলম্বে হেমচন্দ্র শশিভুষণ প্রভৃতি শত্রুহস্তে বদ্ধ হইলেন।

যুদ্ধের সময় হেমচন্দ্রের শস্ত্র-নৈপুণ্য ও সাহস দেখিয়া খগেন্দ্র প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানে তিনি হেমচন্দ্রকে সম্মুখে আনাইলেন, তাঁহার মধুর আকৃতি দর্শনে খগেন্দ্রের মনে এক অভুতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। হেমচন্দ্র ভাবিয়াছিলেন কোন প্রকারেই আততায়ীর মতানুসারে চলিবেন না; কিন্তু যখন তিনি খগেন্দ্রের সান্নিধ্যে নীত হইলেন, তখন আর তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা রহিল না। তিনি খগেন্দ্রের সুন্দর মুখচ্ছবি অবলোকন করিয়া এবং তাঁহার মধুর আলাপে প্রীত হইয়া মনে মনে তাঁহার ভুয়সি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহারা পরস্পরের মনহরণ করিলেন, বলা অতিরিক্ত যে অনতিবিলম্বে তাঁহারা পরস্পর বন্ধুতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলেন। বিধুভুষণ এই সমস্ত অবলোকনে নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন কারারুদ্ধাবস্থায় কণকপুরে কাল যাপন

করিতে হইবে; সম্প্রতি তাহার বিপরীত আচরণ দর্শনে তাহার মন কৃতজ্ঞতা রসে পূর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি পরম কারুণিক পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

খগেন্দ্র শাহাজাবাদ দুর্গে দুই শত সৈন্যসহ জনৈক সেনানীকে রাখিয়া হেমচন্দ্র, বিধুভুষণ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া কণকপুর প্রস্থান করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে আসিয়া তাঁহার কি স্মরণ হইল, অমনি তিনি রামলালকে অন্যান্য লোক সহ বাটী যাইতে অনুমতি করিয়া হেমচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া অন্য একটী পথ অবলম্বনে চলিতে লাগিলেন; যাইবার সময় বলিয়া গেলেন তাঁহারা তিন দিনের মধ্যে কণকপুর উপস্থিত হইবেন।

এ দিকে শাহাজাবাদ হইতে প্রেরিত দূত হুসেনপুর উপস্থিত হইয়া পরাজয় সংবাদ জানাইলেন। সেই সময়ে হুসেনপুরে একটী বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছিল, সুতরাং কেহই পরাজয়ের প্রতিকার চেষ্টা করিল না; শাহাজাবাদ কণকপুরের শাসনান্তর্গতই রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পাঠক! চল আমরা সেই অরণ্যে আর একবার পদার্পণ করিয়া দেখি অবলা কি করিতেছেন, শশিভুষণ কি করিতেছেন, আর সেই পাগলিনীই বা কি করিতেছে। পাগলিনী পুর্ব্বে পুর্ব্বে যথায় ইচ্ছা তথায় যাইত, যথায় ইচ্ছা তথায় থাকিত, কেবল মাত্র মাঝে মাঝে আসিয়া অবলাকে দেখিয়া যাইত, কিন্তু এখন আর পাগলিনী কোথাও যায় না; প্রায় সর্ব্বদাই অবলার সম্মুখে থাকে।

যে দিন অবলা হাসিয়া কথা কহিত, সে দিন পাগলিনীর গায় আনন্দ ধরিত না ; সে দিন পাগলিনী মনের আনন্দে নাচিতে নাচিতে, গাইতে গাইতে, যথায় ইচ্ছা তথায় ঘুরিয়া বেড়াইত ; কিন্তু যে দিন অবলার মুখে একটু মলিনতার আভাস দেখিতে পাইত, যে দিন অবলা হাসিমুখে তাহাকে পাগ্‌লী বলিয়া ডাক না দিত, সেই দিন তাহার অন্তরে আর একরূপ ভাব আসিয়া উপস্থিত হইত ; সে দিন আর সে দূরে বেড়াইতে বাহির হইত না; কেবল আশে পাশে ঘুরিত, হাসিত, গাইত এবং মাঝে মাঝে অবলার সম্মুখে আসিয়া বসিত। আজ কএক্‌দিন যাবৎ পাগ-লিনী অবলার মুখে হাসি দেখে নাই, সুতরাং তাহার ভ্রমণস্থানও অবলার চতুষ্পার্শ্বেই সীমাবদ্ধ ছিল।

অবলা আজ কুটজপার্শ্বে বসিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে পাগলিনী তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া ক্ষণকাল তরে অবলার সমস্ত ভাবনা চলিয়া গেল, তাহার বদন মণ্ডল প্রফুল্ল হইল, তাহার অন্তঃকরণে ক্ষণকালতরে শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। পাগলিনী অনেকক্ষণ পর এবার অবলার নিকট আসিয়াছিল বলিয়াই তাহার মানসিক ভাবের এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। পাগলিনী যখনই অবলার নিকট আসিত, তখনই তাহাকে কিছু না কিছু জিজ্ঞাসা করিত ; অবলা সকল সময়ে তাহার উত্তর করিত না, তথাপি পাগলিনী প্রশ্ন করিতে বিরত হইত না। এবার পাগলিনী জিজ্ঞাসা করিল "খুকি ! নেতে যাবি ?" অবলা বলিল "যাব।"

পাগলিনী হাসিল, অনেকক্ষণ পর অবলার কথা শুনিতে পাইয়া হাসিল এবং তখনি অবলাকে লইয়া গীত গাইতে গাইতে একটী পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হইল। অবলা বলিল "এ পুকুরের জল ভাল না।" পাগলিনীও মনে মনে বলিতে লাগিল

"এ পুকুরের জল ভাল না।" তাহারা সত্বর সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অনতিবিলম্বে একটী দীর্ঘিকা তটে উপস্থিত হইল। পাগ-লিনী এ পুকুরে ডুবাইতে বড় ভাল বাসিত; অবলাও এই স্থানে বসিতে বড় ভাল বাসিত। পাঠক! এ আমাদের সেই শ্যাম পুকুর।

পাগলিনী জলে নামিলে অবলা সিঁড়ির উপর বসিয়া বসিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল। তাহার কেশপাশ পৃষ্ঠদেশে দুলিতে-ছিল, সমীরণ ধীরে ধীরে বহিয়া তাহাদিগকে এপাশ ওপাশ করিতে লাগিল।. দীর্ঘিকার চতুষ্পার্শ্বে যে বৃক্ষগুলি শোভিতে-ছিল অবলা সেই দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল গাছের ডালে সুন্দর সুন্দর পাখী বসিয়া বসিয়া মধুর কণ্ঠে কুজন করিতেছে; পাতা গুলি কাঁপিতে কাঁপিতে তাহাদিগকে ব্যজন করিতেছে; অবলার চক্ষু ক্ষণকাল তরে সেই দিকেই আবদ্ধ রহিল। এক স্থানে দুটী পাখী বসিয়া দীর্ঘিকার জল দেখিতেছিল, হঠাৎ একটি উড়িয়া যাওয়াতে অন্যটীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া গেল; অবলা তাহাদিগের এই কার্য্যপ্রাণালী দেখিয়া একটী নিশ্বাস ছাড়িল।

পাগলিনী ইত্যবসরে একবার অবলার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; এবং তখনি একটী গান মনে পড়িল। পাগলিনী গাইতে লাগিল—

গোলাপ কুসুম, রূপে অনুপম, কণ্টক অধম
তায় ঘেরিল।

পাগলিনীর স্বর সেই অরণ্যানিতে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। দূরস্থ পথ অবলম্বনে একটী যুবক যাইতে ছিলেন, তাহার গান শুনিতে পাইয়া অমনি দাঁড়াইলেন। যুবকের বিশ্বাস ছিল তথায় লোক থাকা নিতান্ত অসম্ভব, অধুনা মনুষ্য-সম্ভব-ধ্বনি

শুনিতে পাইয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অধিক সময় এক স্থানে দাঁড়াইতেও পারিলেন না, কি ভাবিয়া একবার চতুর্দ্দিকে চাহিলেন এবং তখনি ঊর্দ্ধশ্বাসে এক দিকে ছুটিলেন, অন্য কেহ তাহা দেখিতে পাইল না। যুবক কিয়ৎদূর যাইয়া পুনরায় কি ভাবিয়া ফিরিলেন এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পাগলিনী গীতের একচরণ গাইয়াই ডুবাইতে ছিল, সেই গীত আর তাহার মনে পড়িলনা, সে গাইতে লাগিল—

জাগত রে হৃদিমাঝে রূপ অপরূপ
সেই মোহন মূরতি,
জাগত রে মোহন মূরতি।

যুবকের সন্দেহ এবার দূর হইল ; স্ত্রী-কণ্ঠধ্বনি শ্রবণে তাঁহার ভয়, অপেক্ষাকৃত অনেক লাঘব হইল। তিনি এবার সাহসে নির্ভর করিয়া সম্মুখীন হইলেন এবং দেখিতে পাইলেন অনতি দূরে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি দীর্ঘিকাতটে বসিয়া আছে, অপর একটী সেই দীর্ঘিকার জলে স্নান করিতেছে ; দেখিতে পাইয়া একবার চারিদিকে চাহিলেন, কেহকেই দেখিতে না পাইয়া অমনি তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অবলা চাহিয়া দেখিল একটী যুবক সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে ; দেখিয়াই শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের সঙ্গের আর আর লোক কোথায় ?" অবলা এ যুবকের সহিত কথা বলিতে লজ্জা বোধ করিল না, বলিল, "আমাদের সাথে আর কেহ আসে নাই।"

যুবক আশ্বস্তমনা হইলেন এবং ক্ষণকাল সেই স্থানে দাঁড়াইয়া অবলাকে কি কি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অবলা একে একে সেই সমস্তের উত্তর প্রদান করিল। পাগলিনী গীত গাইতে গাইতে উপরে উঠিল, অবলা তাহাকে লইয়া আশ্রমাভিমুখে চলিতে

লাগিলেন ; কিন্তু কিয়ৎদূর না যাইতে না যাইতেই যুবক তাহার গতিরোধ করিয়া বলিলেন "আমাকে ঐ অঙ্গুরীয়ক না দেখাইলে যাইতে দিব না।" অবলা অগত্যা বিরক্ত হইয়া অঙ্গুরীয়ক দেখাইলেন ; যুবক দেখিতে পাইলেন তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে খোদিত আছে "খ—গে—ন্দ্র !" যুবকের শরীর ক্রোধে ও আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে রাস্তা ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন "যাও, আমরাও তোমাদের পশ্চাৎ আসিতেছি।" এই বলিয়া যুবক একটী সঙ্কেত ধ্বনি করিল এবং অনতিবিলম্বে এক খানা শিবিকাসহ অষ্টাদশ মোগলসেনা তথায় উপস্থিত হইল। যুবক শিবিকায় উঠিয়া বসিলেন, শিবিকা ক্রমে ক্রমে শশিভুষণের কুটীর পার্শ্বে উপস্থিত হইল।

পাঠক ! এ যুবককে চিনিতে পারিয়াছ ? আমাদের সেই নাজিমদ্দি। নাজিমদ্দি শত্রুভয়ে অরণ্য পথে যাইতে ছিলেন, পথিমধ্যে পাগলিনীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া দীর্ঘিকা তটে উপস্থিত হন। নাজিমদ্দি রণবেশ পরিত্যাগ করিয়া শিবিকারোহণে যাইতে-ছিলেন, তাঁহার অষ্টাদশ অশ্বারোহীও কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নাজিমদ্দি অবলাকে দেখিয়া ভাবিলেন "ইহার ন্যায় রূপবতী কামিনী পৃথিবীতে নাই, আমি যে রেজিয়াকে দেখিয়া ভুলিয়াছি, ইহার পদনখের সৌন্দর্য্যও তাহাতে নাই ; যে প্রকারেই হউক, ইহাকে লাভ করিতেই হইবে।" নাজিমদ্দি যখন অঙ্গুরীয়কে প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম খোদিত দেখিলেন ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ অবগত হইলেন, তখন যুগপৎ আনন্দে ও ক্রোধে তাঁহার শরীর নৃত্য করিতে লাগিল। অবলা একেত সুন্দরী, তাহাতে আবার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রণয়িনী, এ অবস্থায় তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া নাজিমদ্দি নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য বলিয়া অনুমান করিলেন।

তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন প্রাণ থাকিতে তাহাকে ছাড়িয়া যাই-বেন না।

নাজিমদ্দির প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত হইল। তিনি শশিভূষণ সমীপে উপস্থিত হইয়া অকাতরে স্বকীয় অভিলাষ প্রকাশ করিলেন এবং প্রলোভন দ্বারা তাঁহাকে বশীভুত করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন শশিভুষণ কিছুতেই সম্মত হইল না, বরং তাঁহার ইচ্ছার প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হইয়া স্বকীয় অভি-সন্ধির সিদ্ধি সম্বন্ধে ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল, তখন আর তিনি তাঁহাকে বশীভুত করিবার চেষ্টা না পাইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে হস্ত পদে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া ভুমিতে ফেলিয়া রাখিল, তাঁহার কাতর ধ্বনিতে অরণ্যানি পূর্ণ হইতে লাগিল। নাজিমদ্দি কালবিলম্ব না করিয়া অবলাকে শিবিকায় বদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। অবলা শিবিকায় বসিয়া বসিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল। পাগলিনী এতক্ষণ এদিকে ওদিকে ঘুরিতেছিল, শশিভুষণের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়া কুটজ দ্বারে উপস্থিত হইল এবং স্বকীয় করস্থিত কুঠার দ্বারা শশিভুষণের বন্ধনচ্ছেদন করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল। কতকদূরে আসিয়া শিবিকা দেখিতে পাইল এবং তন্মধ্যে অবলা বদ্ধ রহিয়াছে জানিতে পারিয়া অমনি শিবিকাদ্বারে উপস্থিত হইল এবং এক হস্তে দৃঢ়রূপে শিবিকা আকর্ষণ করিয়া চীৎকার করতঃ বলিয়া উঠিল "তোরা আমার খুকিকে দিয়ে যা।" নাজিমদ্দি পাগলিনীকে চিনিতেন, তিনি পাগলিনীকে ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু পাগলিনী কিছুতেই শিবিকা ছাড়িল না দেখিয়া তাহাকে পদা-ঘাতে দূরে ফেলিয়া দিলেন। শিবিকা চলিতে লাগিল। পাগলিনীর শরীর বিজাতীয় ক্রোধে মুহুর্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিল, আর কাল গৌণ না করিয়া সে শিবিকার পশ্চাৎ দৌড়িল এবং

যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া হস্তস্থিত কুঠার দ্বারা জনৈক বাহকের পদমূলে আঘাত করিল, বাহক পড়িয়া গেল। তাহার তৎসাময়িক রুদ্রমূর্ত্তি দর্শনে নাজিমদ্দিরও মনে কিঞ্চিৎ ভয়ের উদ্রেক হইয়াছিল, বাহকগণও ভয় পাইয়া শিবিকা ছাড়িয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। পাগলিনী এই সুযোগে যেমন শিবিকার মধ্যে প্রবেশ করিল অমনি বাহির হইতে শিবিকার দ্বার রুদ্ধ হইল, পাগলিনী অবলা সহ শিবিকায় বদ্ধ হইয়া রহিল। নাজিমদ্দির অনুমত্যানুসারে বাহকগণ সত্বর গমনে শিবিকা লইয়া বনভুমি অতিক্রম করিয়া চলিল।

নাজিমদ্দির গমনের অব্যবহিত পরেই খগেন্দ্র ও হেমচন্দ্র অশ্বারোহণে শ্যামপুকুর তটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় হেমচন্দ্রকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া খগেন্দ্র কুটীরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কুটজপার্শ্বে যাইয়া দেখিলেন অবলা নাই, পাগলিনী নাই, শশিভুষণ অদূরে এক শিলাতলে নিদিধ্যাসনে উপবিষ্ট আছেন। কুটজালয় শূন্য দেখিয়া খগেন্দ্র অনুমান করিলেন পাগলিনী অবলাকে সঙ্গে লইয়া কোন স্থানে ভ্রমণার্থ নির্গত হইয়া থাকিবে। এবং এই অনুমানে নির্ভর করিয়া তিনি সেই স্থানে বসিয়া কাইক শ্রম বিনোদন করিতে লাগিলেন, শশিভুষণ কিছুই জানিতে পারিলেন না, খগেন্দ্রও স্বার্থতার অনুরোধে তাঁহার পরমার্থ চিন্তনে ব্যাঘাত জন্মাইতে সাহস পাইলেন না। ক্ষণকাল পরে শশিভুষণ নেত্র উন্মীলন করিলেন, দেখিলেন খগেন্দ্র সম্মুখে বসিয়া আছে। দেখিয়াই তাঁহার নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি নিঃসৃত হইতে লাগিল। খগেন্দ্র তাঁহার এই ভাব অবলোকন করিয়া মনে মনে কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন, এবং তদুত্তরে যাহা যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল; ক্রোধে, বিষাদে তাঁহার অন্তর

কাঁপিতে লাগিল ; তিনি আর তিলার্দ্ধ সময়ও বিলম্ব না করিয়া, হেমচন্দ্রের নিকট চলিলেন, পথিমধ্যে একটী উষ্ণীষ দেখিতে পাইয়া অমনি তাহা কুড়াইয়া লইলেন, এবং তন্মধ্যে দেখিতে পাইলেন নাজিমদ্দির নাম স্পষ্টাক্ষরে খোদিত আছে। নাজিমদ্দি যাইবার সময় অসাবধানতাবশতঃ উষ্ণীষ ফেলিয়া গিয়াছিলেন, খগেন্দ্র তাহাই পাইয়া তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং অগৌণে হেমচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত সংবাদ সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া তৎসহ অশ্বারোহণে যবনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

" Alas, Iago !
What shall I do to win my lord again ?
Good friend, go to him ; for by this light of heaven
I know not how I lost him ; here I kneel ;——"

আজ হুসেন আলির শেষ দিন। তাঁহার জীবন-দীপিকা চিরকাল তরে নির্ব্বাপিত হইতে চলিয়াছে ; তাঁহার অতি সাধের জীবন আজ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই যেন উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে। যাহাদের তরে চিরকাল কষ্টভোগ করিয়াছেন, যাহাদের সুখবর্দ্ধনের নিমিত্ত স্বকীয় সুখে কতবার জলাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন, যাহাদের মঙ্গলকামনা হৃদয়ের অন্তস্থলে চিরকাল গাঁথা রহিয়াছে, তাহারা এই সময়ে তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়াই রহিল, কেহ বা একবিন্দু অশ্রুপাত করিল, কেহ বা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল, কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দনের রোল উঠাইয়া দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত করিতে লাগিল ; কিন্তু কেহই কালের করালকবল হইতে

তাঁহার সাধের জীবন রক্ষা করিতে পারিল না। হুসেন্ আলী চতুর্দ্দিকে একবার চাহিলেন,.তাঁহার অন্তর বিষাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল। যাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া জানিতেন, যাহারা শৈশবে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে চির সহচর ছিল, যাহাদের সহিত একত্র আহার একত্র বিহার, চিরকাল একত্র অধিষ্ঠান, মৃত্যু সময়ে তাহাদিগের সহিত একত্র মরিতে পারিবেন না, তাহারা সকলেই সশরীরে পৃথিবীতে বিচরণ করিবে, কেহই তাঁহার সঙ্গী হইবে না, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সমস্ত ছাড়িয়া তিনি একাকী চলিয়া যাইবেন, এ সমস্ত চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নয়ন যুগল হইতে অনর্গলধারে বারিধারা পড়িতে লাগিল, তাঁহার মন তৎসহ অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। অদূরে একটী স্ত্রী-মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া গলদশ্রুলোচনে তাঁহার পানে তাকাইতে-ছিল, হুসেন-আলীর চক্ষু তাহার দিকে ধাবিত হইল; দেখি-লেন তাঁহার সাধের রেজিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতেছে। তিনি রেজিয়াকে বড় ভাল বাসিতেন, বড় আদর করিতেন; রেজিয়াই তাঁহার একমাত্র সন্তান, একমাত্র আনন্দদায়িনী কন্যকা। মৃত্যু সময়েও হুসেন্ আলী একবার তাহার কথা না ভাবিয়া পারিলেন না। তিনি নাজিমদ্দির স্বভাব সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন এবং তজ্জন্যই প্রথমতঃ রেজিয়ার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইলেও মিঞাজানের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করেন। নাজিমদ্দির সহিত পরিণয়কার্য্য সমাধা হইলেও তিনি সর্ব্দাই রেজিয়ার জন্য চিন্তিত থাকিতেন; মৃত্যুসময়েও এই চিন্তায় তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। তিনি উপস্থিত আত্মীয় বর্গের হস্তে রেজিয়াকে সমর্পণ করিলেন ও রেজিয়াকে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে স্বামী পরিত্যক্তা হইলে তিনি কদাচ পুনরায় তাহাকে স্বামীত্বে গণনা করিবেন না ও বিষ পানাদি দ্বারা

আত্মহত্যা করিবেন না। রেজিয়া এ প্রতিজ্ঞার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, অন্য কেহও বুঝিতে পারিল না। তিনি শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হইলেন। হুসেন আলী শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিতপ্রায় দেখিয়া সকলের নিকট হইতে শেষ বিদায় লইলেন ও তৃষিত নয়নে রেজিয়াকে দেখিতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

হুসেন আলীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে নাজিমদ্দি নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি নগরে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই নবাবের মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছিলেন; কিন্তু এই সংবাদে তাঁহার মনে কিঞ্চিন্মাত্রও কষ্টের উদ্রেক হইয়াছিল না। নাজিমদ্দি নবাবকে ভয় করিতেন, ভাল বাসিতেন না। অবলাকে লইয়া আসিবার সময় তাঁহার মনে এই আশঙ্কা হইতেছিল যে নবাব বর্ত্তমান থাকিতে তিনি কখনও তাহাকে লাভ করিতে পারিবেন না, এবং এই চিন্তায় তিনি আকুল হইতেছিলেন; পথিমধ্যে তাঁহার সেই আকুলতা দূরীকৃত হইল। তিনি প্রধান অন্তরায়ের অভাব সংবাদে সানন্দ মনে নগরে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে তিনি রেজিয়াকে না দেখিয়া থাকিতে কষ্টবোধ করিতেন, যখনি যে স্থানে যাইতেন আসিয়াই একবার রেজিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন; কিন্তু এবার তিনি রেজিয়াকে একবার স্মরণও করিলেন না। পিতৃশোকে সন্তপ্তহৃদয়া পতিপ্রাণা রেজিয়া পতির আগমন সংবাদে কিঞ্চিন্মাত্র আশ্বস্তা হইয়াও তাহার সাক্ষাৎলাভ পাইল না।

নাজিমদ্দির উপর অধীনস্থ সৈন্যগণের প্রগাঢ় ভক্তি ও একান্ত অনুরাগ ছিল। তিনি জানিতেন কি প্রকারে অধীনস্থ লোকের ভালবাসা পাইতে হয় এবং ইহাও বুঝিতে পারিতেন যে অধীনস্থ সৈন্যগণের উপর তাঁহার ভবিষ্যতের সুখ দুঃখ সমস্ত নির্ভর

করিতেছে। তিনি পূর্ব্ব হইতেই সৈন্যগণকে বাধ্য রাখিয়াছিলেন এবং সতত তাহাদিগের মঙ্গল কামনা করিয়া আসিতেছিলেন, সৈন্যগণও তাঁহার এ ব্যবহারে মোহিত হইয়া সতত তাহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিত। নাজিমদ্দি নগরে উপস্থিত হইয়াই প্রথমতঃ দুর্গে প্রবেশ করিলেন এবং নবাবের বিয়োগ হইলেও তাঁহার উপস্থিতিতে সৈন্যগণ বিপুল আনন্দ ভোগ করিতে লাগিল।

অবলা পাগলিনীসহ এতক্ষণ শিবিকায় বদ্ধ ছিল, নাজিমদ্দি শিবিকাসহ তাহাদিগকে দুর্গমধ্যে আনাইলেন এবং তন্মধ্যে তাহাদের থাকিবার জন্য একটী কুঠরী নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, তাহারা সেই কুঠরীতে সৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিল। নাজিমদ্দি অবলা ও পাগলিনীর উপর সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন ; মানসিক দুঃখ ভিন্ন ঐ স্থানে অবলার কোন লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। পাগলিনী সকল সময় সেই কুঠরীতে বদ্ধ হইয়া থাকিতে ভাল বাসিত না, সে মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে এ দিক্ ও দিক্ ঘুরিয়া বেড়াইত ; নাজিমদ্দিও পাগলিনীর ইচ্ছার প্রতিবন্ধকতা জন্মাইতেন না। কারণ তিনি জানিতেন পাগলিনী কষ্ট পাইলে অবলার মনে আরও কষ্ট উপস্থিত হইবে। নাজিমদ্দি যত্নে ও তোষামোদে অবলাকে বশ করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন ; কিন্তু তাঁহার অভিসন্ধি কতদূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল, তাহা তিনিই জানেন।

হুসেন আলীর মৃতদেহ সসমারোহে সমাহিত হইলে সৈন্যগণ ও মৃত নবাবের কর্ম্মচারীগণ নাজিমদ্দিকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। নাজিমদ্দি বহুদিন প্রার্থিত নবাবপদবী লাভে উল্লাসিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সেই উল্লাস সমস্ত অন্তঃকরণ অধিকার করিতে পারিয়াছিল না, অবলার রূপরাশি তাঁহার

একাংশ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। নাজিমদ্দি নবাব হই-য়াই প্রচার করিয়া দিলেন, তিনি অগৌণে অবলার পাণিগ্রহণ করিবেন। ওমরাহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া স্ব স্ব পদ ও গৌরবের মস্তকে পদাঘাত করিতে সাহসী হইলেন না; বরং সক-লেই প্রিয়পাত্র হইবার আশায় তাঁহার ইচ্ছাগ্নিতে পূর্ণাহুতি দিতে লাগিলেন। অচিরাৎ বিবাহের দিন ধার্য্য হইয়া গেল। এই সংবাদ শ্রবণে অবলার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, অবলা পিঞ্জরবদ্ধা বিহঙ্গিনীপ্রায় ছট ফট করিতে লাগিল, তাহার তৎসাময়িক মূর্ত্তি দেখিলে সকলেই তাহাকে উন্মাদগ্রস্থা বলিয়া মনে করিত। তাহার এলায়িত কেশপাশ ও ধূলিধূসরিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দর্শনে সমীপস্থ সৈন্যগণও করুণ রসে আর্দ্র হইতে লাগিল। কিন্তু অবলার ক্রন্দনধ্বনি নাজিমদ্দির কর্ণকুহরে প্রবেশ পাইল না; অবলা বৃথা বিলাপ করিতে লাগিল। আর রেজিয়া? পিতৃবৎসলা, শোকাতুরা, পতিপ্রাণা রেজিয়া? একবার চাহিয়া দেখ রেজিয়া কি করিতেছেন! নৃশংস পামর পিশাচচিত্ত নাজিমদ্দি, এই কি তোমার ভালবাসার পরিণাম ফল? এরূপ ভালবাসা কোথায় শিখিয়াছিলে? যাহার অদর্শনে সমস্ত জগৎ আঁধারময় দেখিতে, যাহার দর্শনে মন আনন্দ সলিলে নিম-জ্জিত থাকিত, যাহাকে লাভ করিবার জন্য মিত্রবধ, বন্ধুবধ, আজ তাহারই উপর এ অত্যাচার? ধন্য তোমার জীবনে, ধন্য তোমার ভালবাসায়। তোমার ঐ জীবনে পুরুষত্ব নাই, তোমার ঐ ভালবাসায় স্বাধীনতা নাই। তুমি রূপের দাস, ঐশ্বর্য্যের ভিখারী, ইন্দ্রিয় বিশেষের অসহ্য কণ্ডূয়ন আর যশলিপ্সার ঐকান্তিক অনুরাগ তোমার ঐ ভালবাসার উৎপত্তি স্থল। তোমার ঐ আকৃতি দর্শনে নয়ন অপবিত্র হয়, তুমি

ইন্দ্রিয়পরবশ, বিশ্বাসঘাতক, পাপিষ্ঠ, সর্ব্বথা নরকবাসের উপযোগী।

শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়া, পতিপ্রেমভিখারিণী রেজিয়া এখন পর্য্যন্তও স্বামীর দর্শন পাইলেন না। তাঁহার অন্তঃকরণে বিষাদের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল, তিনি আকুল অন্তরে শতবার দর্শন লাভ প্রার্থনা করিয়া নাজিমদ্দি সমীপে লোক প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার মানসিক অভিনব প্রবৃত্তি দূরীভূত হইল না, বরঞ্চ যতই রেজিয়া তাহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ততই তাহার অন্তর ঘৃণা ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল ; তিনি অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে রেজিয়াকে স্ত্রীত্ব হইতে মুক্তি দিলেন। নব পরিণিতা স্বামী-পরিত্যক্তা পিতৃবৎসলা রেজিয়া পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া ইহকালের নিমিত্ত সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইলেন, এবং অচিরাৎ সুখধামপিতৃপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া সমীপস্থ এক কুটজালয়ে আশ্রয় লইয়া অহর্নিশি নাজিমদ্দির সেই রূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন।

এ দিকে বিবাহের দিন উপস্থিত। সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হইল, সমস্ত নগর লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ; বাদ্যের ঘন রোলে দিগঙ্গন কাঁপিতে লাগিল। নগরবাসিনীরা দলে দলে নব ভাবী মহিষীর রূপ দর্শনার্থ তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিতে লাগিল ; কেহ বা তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল, কেহ বা তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতে লাগিল ; কিন্তু রেজিয়ার নিকট কেহই গেল না, তিনি একাকিনী কুটজপার্শ্বে বসিয়া বসিয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতার প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার চরণতলে কত লোক গড়াগড়ি পাড়িত, পূর্ব্বে তাঁহার অন্দর পুরবাসিনীগণ কর্ত্তৃক পরিপূর্ণা থাকিত ; তাঁহার যখন

ঐশ্বর্য্য ছিল, মান ছিল, তখন তাঁহার আদরও ছিল। আজ তিনি পতিপরিত্যক্তা হইয়া স্বেচ্ছায় সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কুটজালয়ে বাস করিতেছেন, সুশোভিত মন্দিরের পরিবর্ত্তে পর্ণ-শালা তাঁহার আবাসস্থান, আজ তিনি দরিদ্রা, ভিখারিণী। আজ তাঁহার পর্ণকুটীরে বসিয়া কে তাঁহার সহিত সমবেদনা প্রকাশ করিবে? পৃথিবীর এই নিয়ম, আজ যাহার সৌভাগ্যসূর্য্য প্রখর কিরণে দিঙ্‌মণ্ডল ভাসাইতেছে, দেখিবে তাহার সুহৃদের অভাব নাই, বন্ধুর অভাব নাই লোকজনেরও অভাব নাই, সকলেই করযোড়ে তাঁহার নিকট তোষামোদের ধূয়া উঠাইয়া স্ব স্ব কার্য্য সাধনের উপায় করিয়া লইতেছে। কেহই তাহার পর নয়, সকলই তাহার আপন; কেহই তাহার শত্রু নয়, সকলেই তাহার মিত্রস্থানীয়। আর যাহার সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে এবং সেই সূর্য্যালোকে আলোকিত হইবার আর দ্বিতীয় আশা নাই, দেখিবে সে সর্ব্বজনপরিত্যক্তা হইয়া হৃদয়ের নিবিড় আঁধারে আজন্মকাল বাস করিতেছে; সে আলাপের ভিখা-রিণী, অথচ কেহ তাহার সহিত আলাপ করিতেছে না। অবলা নীরবে থাকিতে ভাল বাসিতেন, নীরবে থাকিয়া অশ্রুসেক করিতে ভাল বাসিতেন, তাহার সে আশা পূর্ণ হইত না; রেজিয়া লোকসংসর্গে বিবিধ আলাপে মনোকষ্ট দূর করিতে ভাল বাসিতেন, তাঁহারও সে ইচ্ছা পূর্ণ হইত না। উভয়ে মানসিক কষ্টে জর্জ্জরিত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের সে কষ্ট কেহ বুঝিল না। রেজিয়ার কষ্ট যেমন তেমনি রহিল, অবলার কষ্ট সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রহরেক গতপ্রায়। চন্দ্রমার বাল-কিরণে পৃথিবী ঈষৎ আলোকিত হইয়াছে; শৃগালগণ বনভুমি পরিত্যাগ করতঃ মাঠে বহির্গত হইয়া সেই আলোকে দলবদ্ধ হইয়া চরিতেছিল এবং মাঝে মাঝে কোকিল কণ্ঠে গান গাইয়া সমস্ত প্রাণীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছিল !!! এমন সময়ে রামপুরার প্রান্তর মধ্যস্থ পথ অবলম্বনে দুইটী অশ্বারোহী পুরুষ গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বসন ভূষণ স্বেদজলে আর্দ্র হইয়াছিল, পরিশ্রমে তাঁহারা নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি বায়ুবেগে চলিতে লাগিলেন। পাঠক! এ আমাদের খগেন্দ্র ও হেমচন্দ্র। আমরা পূর্ব্বে একবার ইহাঁদিগকে যবন অন্বেষণে বহির্গত হইতে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু ইহাঁদের আশা ফলবতী হয় নাই, ইহাঁরা কানন ভুমি খুঁজিয়াও যবনের কোন উদ্দেশ পান নাই। খগেন্দ্র যখন দেখিলেন কোন প্রকারেই যবনের সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর নহে তখন তিনি অগৌণে ত্রস্ত গমনে হেমচন্দ্র সহ কণকপুরাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন, অশ্বগণ তাঁহাদের মানসিক গতির অনুসরণ করিয়াই যেন চলিতে লাগিল। তাঁহারা প্রান্তরের পর প্রান্তর অতিক্রম করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎকাল পরেই কণকপুরে উপস্থিত হইলেন। খগেন্দ্র অশ্ব হইতে অবতরণ পুর্ব্বক হেমচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া রামলাল সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার নিকট সমস্ত সংবাদ যথাযথ বর্ণন করিলেন। রামলাল সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া এবং প্রিয় সুহৃদের অপমানে নিজকে অপমানিত বোধ করিয়া অমনি মহারাজা মাণিকলাল সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং আনুপূর্ব্বিক যথাশ্রুত সমস্ত সংবাদ

তৎসমীপে নিবেদন করিয়া প্রতিশোধ লইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। পুত্র প্রতি মাণিকলালের একান্ত অনুরাগ ছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ রামলালের প্রার্থনার অনুমোদন করিলেন। রামলাল পূর্ণমনোরথে বন্ধু সমীপে আসিয়া মহারাজের অনুমতি জানাইলেন। খগেন্দ্র কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন এবং ক্ষণকাল বিশ্রামের পর হেমচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি পরিজন সমীপে হেমচন্দ্রের গুণ ও সাহসের ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার পরিচয় দিলেন এবং সকলকে অনুরোধ করিলেন তাঁহারা যেন হেমচন্দ্রকে তাঁহার প্রিয় সুহৃৎজ্ঞানে স্নেহ করেন। মানসিক ব্যাকুলতায় তাঁহাকে অধিক সময় বিশ্রাম করিতে দিল না। তিনি অগৌণে আহারাদি সমাপন করিয়া হেমচন্দ্রকে লইয়া রামলাল সমীপে উপস্থিত হইলেন।

এ দিকে রামলাল হেমচন্দ্রকে বিদায়দিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই দুই সহস্র অশ্বারোহীপুরুষ সজ্জিত করিয়া খগেন্দ্র ও হেমচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং যখন হেম ও খগেন্দ্র দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন তখন সমস্ত প্রস্তুত দেখিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন। এবং অবিলম্বে প্রস্থানের সমস্ত উদ্যোগ শেষ হইলে মহারাজের উপদেশানুসারে কার্য্যদক্ষ, সুচতুর বিধুভূষণকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন স্থির হইল। বিধুভূষণ অনেক দিন নবাব বাড়ী ছিলেন এবং তাঁহার বাটী সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত ছিলেন, মহারাজ তজ্জন্যই বিধুভুষণকে সঙ্গে লইয়া যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। খগেন্দ্র, হেমচন্দ্রকে লইয়া যাওয়ার কোন আবশ্যকতা নাই অনুমান করিয়া তাহাকে বাটী রাখিয়া অনতিবিলম্বে রামলাল বিধুভুষণ ইত্যাদি সহ হুসেনপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হেমচন্দ্র দৈবসিক পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত

হইয়া পড়িয়াছিলেন সুতরাং শয্যাতলস্পর্শমাত্রেই নিদ্রাদেবীর মায়াজাল তদুপরি বিন্যস্ত হইল। হেমচন্দ্র যথাসুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

খগেন্দ্র ভিন্ন মহারাজ মাণিকলালের অন্য কোন পুত্র সন্তান ছিল না; একটী মাত্র কন্যা ছিল, তাহার নাম কণকলতা। তিনি কণকলতাকে বড় ভাল বাসিতেন, তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন এবং যে প্রকারে ভবিষ্যতে সুখে কাল কাটাইতে পারে তাহার চেষ্টায় সতত রত ছিলেন। রাজতনয়া বলিয়া কণকলতার মনে কোন গৌরব ছিল না; সে সমবয়স্কাগণের সহিত মিষ্টভাষায় আলাপ করিতে ভালবাসিত, কাহাকেও উচ্চ কথা কহিত না, কেহ তাঁহার আলাপ অথবা ব্যবহারে কোন সময়ে কোন কষ্টভোগ করেন নাই। তাহার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল; সেও সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনজনিত বিমল আনন্দ উপভোগ করিত। সাধারণতঃ বড় ঘরের মেয়েরা যেরূপ বাল্যকালে পুতুল লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকে, যৌবনে সৌন্দর্য্য লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকে এবং অলসতানিবন্ধন অকালে বার্দ্ধক্য দশায় উপস্থিত হইয়া নিতরাং অকর্ম্মণ্যা হইয়া পড়ে, কণকলতা যে প্রকারে সেই শ্রেণীভুক্তা না হইতে পারে মহারাজ তদ্দিকে সতত দৃষ্টি রাখিতেন। কণকলতাও পিতার উপদেশানুযায়ী কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া অতি অল্প বয়সেই বিবিধ গুণে অলঙ্কৃতা হইয়া উঠিল।

কণকলতার বয়স তের বছর। মহারাজ তাহাকে সৎপাত্রস্থা করিবার জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত থাকিতেন। তিনি হেমচন্দ্রকে রূপে ও গুণে সর্ব্বথা কণকলতার উপযুক্ত দেখিয়া তাহারই নিকট কন্যাদান করিবেন মনে মনে ঠিক্ করিলেন; তাঁহার মানসিক ভাব কেহ ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিল না।

যে দিন হেমচন্দ্রের সহিত কণকলতার সাক্ষাৎ হয় সে দিন হইতেই উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরাগ বদ্ধমূল হয়। কিন্তু তাহাদের সেই অনুরাগ অন্য কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। হেমচন্দ্র বিবেচক ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার বিদ্যা এবং গাম্ভীর্য্য অবলোকনে মহারাজ নিতান্ত প্রীত হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্র যদিও কণকলতাকে ভাল বাসিতেন এবং তাহার অদর্শনে মনে কষ্ট পাইতেন, তথাপি এতদূর সতর্কতার সহিত চলিতেন যে কোন ব্যক্তি তাহার মনের ভাব উপলব্ধি করিতে পারিত না। সুতরাং কণকলতা ভাবিতেন হেম তাহাকে ভাল বাসেন না, হেমচন্দ্রও মনে করিতেন কণকলতা তাহাতে অনুরাগিণী নহে। এই সন্দেহ উভয়ের পক্ষেই নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠিল, তাঁহারা কতকাল এইরূপ কষ্টে যাপন করিয়াছিলেন তাঁহারাই বলিতে পারেন।

পাঠক! তুমি সৌন্দর্য্য বর্ণনা ভাল বাস? কণকলতা যে সৌন্দর্য্যে অলঙ্কৃতা সেই সৌন্দর্য্য একবার অক্ষরে অঙ্কিত দেখিতে চাও? তুমি বিমলাকে দেখিয়াছ, প্রমীলাকে দেখিয়াছ, কুন্দনন্দিনীকে দেখিয়াছ, আবার তিলোত্তমার রূপের সহিত আয়েষার সৌন্দর্য্য তুলনা করিয়া দেখিয়াছ; তুমি তাহাদের রূপ বর্ণনা পাঠে পরিতৃপ্ত হইয়াছ। আরও সৌন্দর্য্য বর্ণনা চাও? তোমার আশা বিফল হইবে। এ গ্রন্থকার রূপ বর্ণনা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এ যাহাকে কুৎসিতা দেখে, লোকে তাহাকে সুন্দরী বলিয়া থাকে, এবং এ যাহাকে সুন্দরী বলে লোকে তাহাকে কুৎসিতা বলিয়া ব্যাখ্যা করে। সৌন্দর্য্য বর্ণনা বিষয়ে ইহার সহিত অন্যান্য লোকের সহিত ঐকমত্য নাই; তুমি যে ইহার রূপ বর্ণনায় সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হইবে, তাহা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? তবে যদি নিতান্তই কণকলতার সৌন্দর্য্য

একবার দেখিতে চাও, পৃথিবীতে তুমি যাহাকে সুন্দরী দেখ এবং অনিবার যাহার মুখদর্শনে অন্তরাত্মাকে পরিতৃপ্ত বোধ কর, এক-বার তাহার পানে তাকাও, দেখিবে কণকলতার প্রতিমূর্ত্তি তাহাতে সুন্দররূপে চিত্রিত রহিয়াছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আজ নাজিমদ্দির বিবাহ, অবলার বিবাহ। সমস্ত দিক্ হাসিতেছে—সমস্ত দিক্ নূতন সজ্জায় সজ্জিত, নূতন শোভায় শোভিত। চিরাভিলষিত বিবাহ সময়ে বরের হৃদয় যে সুখে নৃত্য করিতে থাকে, নাজিমদ্দি আজ সে সুখে সুখী, সমূহ বিপদে লোকের মন যে দুঃখে নৃত্য করিতে থাকে, অবলা আজ সে দুঃখে দুঃখিনী। নাজিমদ্দি ভাবিতেছে আজই তাঁহার সমস্ত দুঃখের শেষ দিন, অবলাও ভাবিতেছে আজ তাহার সমস্ত দুঃখের অব-সান হইবে। নাজিমদ্দি সিংহাসনে বসিয়া ভাবিতেছেন, অবলা—ভূশয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতেছে।

নাজিমদ্দি কি কেবল সুখের ভাবনাই ভাবিতেছিলেন? কখনই নয়। তাঁহার মন পর্য্যায়ক্রমে সুখে ও ভয়ে নৃত্য করিতেছিল; এ সুখ চিরবাঞ্ছিত প্রিয়জন লাভের, এ ভয় চির-আশঙ্কিত শত্রুর আক্রমণের। নাজিমদ্দি জানিতেন খগেন্দ্র চুপ করিয়া থাকিবার লোক নন, এবং যদি তিনি সময়ে ঐ সংবাদ পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে অবিলম্বে সসৈন্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন। এই ভয়ে নাজিমদ্দি ভীত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরাত্মার প্রতিমূর্ত্তি বহিরাকৃতিতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল;

তিনি একবার ভাবী সুখচিন্তায় প্রসন্ন হইতে লাগিলেন, একবার ভাবী অশুভ আশঙ্কায় ভীত হইতে লাগিলেন। নাজিমদ্দি ভীত হইতেছিলেন কেন? তাঁহার অধীনে কি সৈন্য নাই—যোদ্ধা নাই? তবে তাঁহার ভাবনার কারণ কি? ভীতির কারণ কি? ঈশ্বরদত্ত বিবেক শক্তিই উহাদের কারণ। তুমি আস্তিকই হও আর অনীশ্বরবাদীই হও, তোমার অন্তরে নাস্তিকতার স্রোত প্রবাহিত হউক আর না হউক, বিবেকশক্তির অনতিক্রমনীয় প্রভাব তোমার অন্তরে প্রবেশ করিবেই করিবে। তুমি ঐ শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য। যখনি কোন অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে তখনি ঐ শক্তির সুন্দর ছবি তোমার অন্তরে প্রতিফলিত হইবে। এ নিয়ম স্বাভাবিক, মনুষ্যবুদ্ধি-কল্পিত নহে। যে স্থানে এ নিয়মের অনুপস্থিতি, সে স্থান গরলপূর্ণ, সে স্থান মনুষ্যচক্ষুর অগোচর। নাজিমদ্দি এ নিয়মের প্রভাব সহসা অতিক্রম করিতে পারিলেন না, তিনি লোকলজ্জাভয়ে ভীত ছিলেন না, ধর্ম্মভয়েও ভীত ছিলেন না, কিন্তু বিবেকের ভ্রূকুটি-কুটিলমুখ দর্শনে তাঁহার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হইল; অভিলষিত কার্য্যের অনৌচিত্য এবং সমূহ বিপদের আশঙ্কা তাঁহার চিত্তকে বিলোড়িত করিয়া তুলিল। কিন্তু তাঁহার মানসিক অস্থিরতার নিকট বিবেকের এ শাসন অধিকক্ষণ স্থান পাইল না। তিনি কিয়ৎকাল পরে স্থির করিলেন যত শীঘ্র কার্য্য সমাধা হইয়া যায় ততই মঙ্গল, তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণও এ মতের পোষকতা করিতে লাগিল। সুতরাং অনতিবিলম্বে বিবাহের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হইল; নির্দ্দিষ্টা পুরসুন্দরীগণ ভাবী বেগমকে বিবাহোপযুক্ত বেশভূষায় সাজাইতে তৎসমীপে উপস্থিত হইতে লাগিলেন; মঙ্গল বাদ্যের মঙ্গল ধ্বনিতে নগর উথলিত হইতে লাগিল।

অবলা ভূশয্যায় শয়ন করিয়া সেই শব্দ শুনিতে পাইল। ক্রমে বাদ্যধ্বনি যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল তৎসহ অবলার চেতনাও সেই পরিমাণে লোপ পাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার এ অবস্থাও অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না; বাদ্যধ্বনির দ্বিগুণতর শব্দ এবং চতুর্দ্দিকে কোলাহল শুনিতে পাইয়া অবলা ভাবিল সত্বরই তাহাকে বিবাহোপযোগী বেশভূষায় ভূষিত হইয়া বিবাহস্থলে উপস্থিত হইতে হইবে এবং এ চিন্তায় এতদূর আক্রান্ত হইল যে সে সহসা অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। পুরসুন্দরীগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার এ অবস্থা দর্শনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, এমন সময়ে জনৈক সেনানী সেই কামরায় উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সহসা সকলেই সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। যুবক অবলার মস্তক নিজ অঙ্কে স্থাপিত করিয়া জলসেক করিতে লাগিলেন এবং আস্তে আস্তে ব্যজন করিয়া তাহাকে চৈতন্য করাইলেন। অবলার জ্ঞান হইল, শুনিতে পাইল সে শব্দ, সে বাদ্য সে রব আর সেরূপ নাই। অবলার নয়ন এখনও নিমীলিত। অবলা উঠিতে চেষ্টা করিল, পারিল না; তাহার মস্তক পুনরায় যুবকের ক্রোড়ে পড়িয়া রহিল। যুবক এবার আশ্বস্ত হইয়া ডাকিলেন "অবলে!" অবলা শব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিতে পাইল সম্মুখে খগেন্দ্র!!!

পাঠক! যে শব্দ শ্রবণে অবলা গতচেতনা হইয়াছিল, সে শব্দ বিবাহ বাদ্যের ঘনরোল অথবা জনতার আনন্দধ্বনি নহে। রণবাদ্যের ঝম্‌ঝমা, সৈন্যগণের হুহুঙ্কার, এবং পলাতকগণের পলায়নপরতাই তাহার একমাত্র কারণ। অজ্ঞান অবলা তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল না। তাহার মনে যে ভাবের তরঙ্গ বহিতেছিল, বাহ্যিক জগতের কার্য্যকলাপও তাহার নিকট তদনুযায়ী বলিয়া বোধ হইতেছিল। এটী আমাদের স্বাভাবিক নিয়ম।

যখন তুমি মনোদুঃখে মনে মনে ক্রন্দন করিতে থাক, সুদূরস্থ গীতধ্বনিও তোমার নিকট সকরুণ বিলাপধ্বনিতে পরিণত হইবে ; আবার যখন তুমি সানন্দ চিত্তে, মধুর আলাপে—মধুর ভাবে ডগমগ হইতে থাক, তখন দেখিতে পাইবে সমস্তই তোমার আনন্দ বর্দ্ধন করিবে ; বিলাপোক্তি, আর্ত্তনাদ, ক্রন্দন-ধ্বনি কিছুই তোমার অন্তরে অবকাশ পাইবে না, তখন দেখিবে বিশ্ব সংসার তোমার নিকট আনন্দময়,—যাহা কিছু শুন, যাহা কিছু বল, যাহা কিছু ভাব, সমস্তই আনন্দময় !!! অবলার মনে দুঃখের বাত্যা বহিতেছিল, সুতরাং যাহা কিছু শুনিয়াছিল, ভাবিয়াছিল, সমস্তই তাহার নিকট প্রবলতর ভাবী দুঃখের কারণ বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। এবং এই অনুমান হইতেই তাহার বিষণ্ণতার উৎপত্তি ; বলা বাহুল্য যে এই বিষণ্ণতার আধিক্যতাই তাহার অজ্ঞানতার মূলীভূত কারণ। অবলা প্রথমতঃ যখন খগেন্দ্র-কে দেখিতে পাইল তখন সে তাহার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না, যখন দ্বিতীয়বার দেখিল তখনও তাহার বিশ্বাস হইল না, কিন্তু যখন তৃতীয়বারও সেই মূর্ত্তিই দেখিতে পাইল, তখন আর তাহার মনে সন্দেহ রহিল না ; অবলা অনেক দিনের পর সুখের মুখ দেখিতে পাইল, তাহার নয়ন হইতে আপনা-আপনি বারিধারা পতিত হইয়া খগেন্দ্রের পরিধান বসন সিক্ত করিতে লাগিল।

এ দিকে নাজিমদ্দি সংবাদ পাইলেন তাঁহার নগর শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। তাঁহার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি এত সহসা আক্রান্ত হইবেন ইহা স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন না। শত্রু কোথায় ছিল ? কিরূপে আসিল ? তিনি কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। নগরদ্বারে যাইয়া দেখিতে পাইলেন, যে রূপ দ্বার সেরূপই রহিয়াছে। প্রহরীগণ যথানিয়মে পাহারা

দিতেছে। তিনি অনতিবিলম্বে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া একটী গুপ্ত পথে চলিতে লাগিলেন, কতকদূর যাইয়া দেখেন সেই স্থানে লোকারণ্য। নাজিমদ্দি ফিরিলেন। ফিরিয়া দেখিলেন বিধুভুষণ সসৈন্যে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন, দেখিয়াই তাহার প্রাণ চমকিয়া গেল, তিনি অবিলম্বে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিলেন। বিধুভুষণকে দেখিতে পাইয়া নাজিমদ্দির মন ক্রোধে, বিষাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি তখনি বুঝিতে পারিলেন যে বিধুভুষণের চাতুরিতেই শত্রু নগরে প্রবেশলাভ করিয়াছে। তিনি বিধুভুষণের বিশ্বাসঘাতকতায় মর্ম্মে দুঃখ পাইলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে প্রকারেই হউক তাহার এ বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি প্রদান করিবেন।

পাঠক! তুমিও কি বিধুভুষণকে বিশ্বাসঘাতক মনে করিবে? তিনি কোন্ বিষয়ে বিশ্বাসঘাতকী? তিনি হুসেন আলীর প্রিয়-পাত্র ছিলেন; যাহাতে হুসেন আলীর মনস্তুষ্টি হইত তিনি সর্ব্বদা তাহাই করিয়া আসিয়াছেন, আজও তিনি তাঁহারই প্রেতাত্মার শান্তির নিমিত্ত এ যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছেন। বিধুভুষণ রেজিয়াকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন; নাজিমদ্দি অন্য এক রমণীর প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইয়া তাঁহাকে চিরদিনতরে সুখে বঞ্চিত করিবেন, ইহা বিধুভুষণ সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন না, তাই তিনি মনের আক্রোশে এবং বিষাদে এ যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ কণকপুর হইতে বহির্গত হওয়ার সময়ও তিনি জানিতেন না কোথায় কি উদ্দেশ্যে যাইতে হইবে, পথিমধ্যে সমস্ত সংবাদ যথাযথ অবগত হইয়া তাঁহারি মন অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল; এ যুদ্ধে তাঁহার উপস্থিতিও সেই মানসিক গতিরই পরিচয়।

অনতিবিলম্বে হুসেনপুর অধিকৃত হইল। কিন্তু বিধুভুষণের আজ্ঞানুসারে সৈন্যগণ নগর লুণ্ঠন প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে

পারিল না। হুসেনপুর যেরূপ সেরূপই রহিল। খগেন্দ্র অবলার জন্য আসিয়াছিলেন, অবলাকে পাইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন, অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন না। তাঁহারা সকলে অগৌণে অবলাকে লইয়া কণকপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

খগেন্দ্র চলিয়া গেলে নাজিমদ্দি নগরে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ ধূলি শয্যায় শয়ন করিয়া চিরকালতরে যথা সুখে নিদ্রা যাইতেছে। এ দৃশ্য তাঁহার নিকট ভয়ঙ্কর অথচ বিষাদময় বোধ হইতে লাগিল, তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন যে তাঁহারই সুখের জন্য এতগুলি বিশ্বস্ত অনুরক্ত, প্রভুপরতন্ত্র ব্যক্তি অকাতরে অমূল্য জীবন ত্যাগ করিয়াছে, তাঁহারই নির্ব্বুদ্ধিতা, মূঢ়তা এবং ভোগাভিলাষেচ্ছার দরুণ এতগুলি জীবন পৃথিবী হইতে অসময়ে অন্তর্হিত হইয়াছে। তাঁহার মন দুঃখে অভিভুত হইল, তিনি আপনাকে আপনি ধিক্কার করিতে লাগিলেন। নাজিমদ্দি সেই স্থানে অধিক সময় দাঁড়াইতে পারিলেন না, তাঁহার মন শোকে ও দুঃখে অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, সুতরাং তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া অনতিবিলম্বে দুর্গে প্রবেশ করিলেন। অবলা ও পাগলিনী যে কামরায় বদ্ধ ছিল নাজিমদ্দি সেই কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, তথায় অবলা নাই, পাগলিনী নাই, কেহই নাই। দুর্গস্থ সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলেন কেহকেই দেখিতে পাইলেন না, অবশেষে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন তথাপি কেহকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার অন্তঃকরণে নৈরাশ্যের স্রোত অবিশ্রান্ত বহিতে লাগিল। যে হুসেনপুরে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়া নানাবিধ আমোদ আহ্লাদে রত ছিল, যথায় পুরসুন্দরীগণের মঙ্গলধ্বনি, বাদ্যের ঘনরোল, যুব বৃদ্ধ বালকের আনন্দোৎসব যুগপৎ ক্রীড়া করিতে-

ছিল, আজ নাজিমদ্দি তথায় কিছুই শুনিতে পাইলেন না, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। লোকাভাবে সমস্ত স্থান হা হা করিতে-ছিল। নাজিমদ্দি সেই নির্জ্জনপুরীতে বসিয়া বসিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন "হায়, কেন আমার ঐরূপ বুদ্ধি হইয়াছিল, কেন-ইবা আমি অবলাকে আনিয়াছিলাম, তাহাকে না আনিলে আজ এ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না, এ অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইত না। পূর্ব্বে যদি জানিতাম, এমন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। আমি নিতান্ত অপদার্থ, নিতান্ত জঘন্য-প্রবৃত্তির লোক। অথবা বৃথা আমি আমাকে নিন্দা করিতেছি কেন? আমি আমার দুঃখের কারণ নই, অবলাও আমার এ দুঃখের কারণ নয়। অবলার অপরাধ সে সুন্দরী, আমার অপরাধ আমি তাহার সেই রূপ দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু এ অপরাধে আ-মার কি ক্ষতি করিয়াছে? আমার মতে কিছুই নয়। তবে আজ এ বিশালপুরী শূন্য কেন? আজ আর হেথা আমোদ-হিল্লোলের সুগন্ধি পবন বহিতেছে না কেন? ইহার কি কারণ কিছুই নাই? না থাকিবে কেন? বিধুভুষণই ইহার কারণ। বিধুভুষণ! নিশ্চয় জানিও, যতদিন নাজিমদ্দির এ জীবন এ দেহপঞ্জর হইতে বহির্গত না হইবে ততদিন তোমার মঙ্গল নাই। তোমার ঐ জীবনের উপর এক মুহূর্ত্তরেও আশা করিও না, জানিও উহা নাজিমদ্দির হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। যে পর্য্যন্ত তোমার ঐ বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি প্রদান না করিতে পারিব, সে পর্য্যন্ত আর শান্তির বিমলসুখ ভোগ করিতে সক্ষম হইব না।"

নাজিমদ্দি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার রাগ তাহাতেই লোপ পাইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে তিনি পুনরায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবলার কামরায় প্রবেশ করিলেন, অমনি তাঁহার অবলাকে মনে পড়িল। কিন্তু অবলার যে রূপ দেখিয়া ভুলিয়া

গিয়াছিলেন সে রূপ আর তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইল না। তিনি সেই মূর্ত্তিকে আর একবার অন্তরে প্রতিফলিত দেখিতে বারংবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল, তিনি অবলাকে মনে করিতে পারিলেন না। নাজিমদ্দি বিরক্ত চিত্তে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া চলিতে লাগিলেন ; এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন অনতিদূরে একটী স্ত্রীলোক করুণস্বরে গান গাইয়া সেই বিজন ভুমির নির্জ্জনতাকে দূর করিতেছে। নাজিমদ্দি অবহিত চিত্তে সেই গান শুনিতে লাগিলেন ; গান নিশিথিনীর গভীরতা ভেদ করিয়া সেই প্রাসাদে ধ্বনিত হইল—

"মরণ রে,
শ্যাম তোঁহারই নাম,
চির বিসরল যব্ নিরদয় মাধব
তুঁহুঁ ন ভইবি মোয় বাম।"

নাজিমদ্দি চমকিলেন। এ বিজন ভুমিতে গভীর নিশিথে এ কণ্ঠস্বর কাহার ? অনতিবিলম্বে তিনি স্থির করিলেন রেজিয়াই গান গাইতেছে। রেজিয়া এ গান কোথায় শিখিল ? নাজিমদ্দি রেজিয়াকে এ গীত গাইতে আর শুনেন নাই ; সুতরাং তাঁহার অন্তরে পুনরপি সন্দেহের বাত্যা উপস্থিত হইল। তিনি এবার অধিকতর মনযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন—পূর্ব্ববৎ গান হইল।

"আকুল রাধা রিঝ অতি জর জর
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝর ঝর
তুঁহুঁ মম মাধব তুঁহুঁ মম দোসর
তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও,
মরণ তু আওরে আও!"

নাজিমদ্দির নয়ন হইতে একবিন্দু অশ্রু পতিত হইল; তিনি ঐ স্থানে আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, অনতিবিলম্বে সেই শব্দ লক্ষ্যে চলিলেন এবং কিয়ৎদূর যাইয়া দেখিতে পাইলেন শীর্ণদেহা মলিন-বসনা রেজিয়া মনের দুঃখে গান করিতেছে, তাঁহার বক্ষস্থল নয়ন জলে ভাসিয়া যাইতেছে, দেখিয়া নাজিমদ্দির অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। রেজিয়ার এ অবস্থা দর্শনে তাঁহার মনে আজ এক অনির্ব্বচনীয় ভাব উপস্থিত হইল; তিনি গলদশ্রুলোচনে, নিমীলিত নয়নে রেজিয়া সমীপে উপস্থিত হই.লন, রেজিয়াও তাঁহার এ অবস্থা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার নয়নধারা দ্বিগুণ প্রবাহে বহিতে লাগিল। ক্ষণকাল উভয়েই নিঃশব্দে রোদন করিলেন, কেহর মুখ হইতে একটী কথা বাহির হইল•না। নাজিমদ্দি অনিমিষ নয়নে আর একবার রেজিয়াকে দেখিতে লাগিলেন, দেখিলেন তাঁহার সৌন্দর্য্য অনুপমেয় আশ্চর্য্য! উহাতে নূতনত্ব আছে, কমনীয়তা আছে, মধুরিমা আছে, সমস্তই আছে। রেজিয়াকে আজ এ অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার মন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি আর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, অনতিবিলম্বে রেজিয়ার পদপ্রান্তে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কতক্ষণ ক্রন্দন করিয়াছিলেন তিনিই জানেন; কিন্তু ক্ষণকাল পরে মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিতে পাইলেন রেজিয়া আর তথায় নাই, আশে পাশে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, রেজিয়া নাই; উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া দেখিলেন, রেজিয়া নাই;—রেজিয়া আজ পলায়ন করিয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"Howl, howl, howl, howl ! O, you are men of stones :
Had I your tongues and eyes I'ld use them so
That heaven's vault should crack. She's gone for ever !
I know when one is dead, and when one lives ;
She is dead as earth. Lend me a looking-glass ;
If that her breath will mist or stain the stone,
Why, then she lives."

এ দিকে বিধুভুষণ, খগেন্দ্র, রামলাল প্রভৃতি সকলে যথা-সময়ে কণকপুর উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের অন্তরাত্মা আজ শান্তির বিমল সুখভোগ করিতে লাগিল। মাণিকলাল তাঁহা-দিগের আগমন সংবাদে হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং অচিরাৎ যথা বিহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিধুভুষণকে সসমাদরে গ্রহণ করিলেন। রামলাল অবলাকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং কণক-লতার সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। কণকলতার এমন কোন সখী ছিল না, যাহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়া মানসিক যন্ত্রণার অসহনীয়তা প্রশমন করে, সুতরাং অধুনা অব-লাকে পাইয়া তাহার মনের মলিনতা অনেকাংশে অন্তর্হিত হইল। অবলাও তাহাকে পাইয়া আহ্লাদিতা হইল।

প্রথমতঃ যখন বিধুভুষণ অবলাকে দর্শন করেন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণে এক অভুতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। আধ্যাত্মিক-বিজ্ঞানবিৎগণ বলিয়া গিয়াছেন যে অনুরূপ আকৃতি দর্শনে মনুষ্যগণ সেই আকৃতির অনুরূপ, পূর্ব্ব-পরিচিত, ধ্বান্তনিহিত আকৃতি বিশেষ স্মরণ করিতে সক্ষম হয়। অবলার আকৃতি দর্শনে বিধুভুষণের অন্তরে সহসা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি-মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইল। তিনি আর একবার অধোবদনে বসিয়া বহুদিন বিস্মৃত সেই দেবীমূর্ত্তির চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন,

তাঁহার নেত্রযুগল হইতে আপনাআপনি অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

মাণিকলাল অনেক দিন যাবৎ ভাবিতেছিলেন বিধুভূষণের নিকট তাঁহার মানসিক অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া অভিলষিত কার্য্য সিদ্ধি বিষয়ে উদ্যোগী হইবেন; কিন্তু বিধুভূষণের আন্ত-রিক মলিনতার দরুণ তাঁহার ইচ্ছা সহসা সফল হইতে পারে নাই। একদা তিনি নির্জ্জনে বসিয়া আছেন এমন সময়ে বিধু-ভূষণ তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। মাণিকলাল বারংবার তাঁহার মানসিক দুর্ব্বলতার কারণ জিজ্ঞাসু হইয়াও বিশেষ কোন উত্তর পান নাই, তথাপি আর একবার জিজ্ঞাসা করিলেন। বিধুভূষণ এবার তাঁহার অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। তিনি আদ্যন্ত সমস্ত বিষয় তাঁহার নিকট জ্ঞাপন করিলেন ও অবলার আকৃতি দর্শনে তাঁহার মনে যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহাও প্রকাশ করিয়া কহিলেন। মাণিকলাল তৎ-সমস্ত শ্রবণ করিয়া অনতিবিলম্বে হেমচন্দ্র ও খগেন্দ্রকে ডাকাই-লেন এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে তৎসংক্রান্ত যাহা কিছু শুনিতে পাইলেন, তাহাতে তাঁহার মনে এক বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি অবিলম্বে শশিভূষণকে লইয়া আসি-বার জন্য খগেন্দ্র ও রামলালকে যথাস্থানে পাঠাইয়া দিলেন।

শশিভূষণ সেই আঘোর অরণ্যে বসিয়া বসিয়া ধ্যানস্তিমিত নয়নে পরমাত্ম-চিন্তনে রত ছিলেন; এমন সময়ে খগেন্দ্র ও রামলাল তথায় উপস্থিত হইয়া আদ্যন্ত সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলেন এবং মহারাজা মাণিকলালের সন্দেশ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত কণকপুর উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিলেন। শশিভূষণ প্রথমতঃ অস্বীকার করিয়া-ছিলেন; কিন্তু বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়া এবং খগেন্দ্রের নিকট সমস্ত

সংবাদ অবগত হইয়া আর দ্বিতীয়বার অস্বীকার করিলেন না। তিনি বহুকাল পরে পুনরায় লোকালয় দর্শন করিতে গমন করিলেন।

খগেন্দ্র ও রামলাল শশিভূষণকে সঙ্গে করিয়া যথা সময়ে কণকপুরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের আগমন সংবাদে বিধুভূষণ ও হেমচন্দ্র নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, মাণিকলাল তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া শশিভুষণ সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং তৎপরে যাহা কিছু দেখিতে পাইলেন তাহাতে তাঁহার অন্তর আনন্দিত ও বিস্মিত হইল। শশিভুষণ বহুকাল পরে অনুজের দর্শন পাইয়া শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহার নয়নধারা অবিশ্রান্ত বহিতে লাগিল। ক্রমে হেমচন্দ্র ও অবলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অবলা সেই অঘোর অরণ্যে যাঁহাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেন এখন তাঁহার পরিচয় পাইলেন। শশিভুষণ, অবলা ও পাগলিনী সম্বন্ধে অনুমান দ্বারা যাহা কিছু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন তৎসমস্ত বিধুভুষণকে জানাইলেন ; বিধুভুষণ সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া সেই পাগলিনীকে একবার দেখিবেন মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন।

মাণিকলাল যখন দেখিলেন বিধুভুষণের মনোমালিন্য অধিকাংশে হ্রাস পাইয়াছে, তখন তাঁহার নিকট স্বকীয় মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন। শশিভুষণ ও বিধুভুষণ উভয়েই সন্তুষ্ট চিত্তে সেই মতের অনুমোদন করিলেন। অবিলম্বে স্থিরীকৃত হইল আগামী চতুর্থ দিবসে হেমচন্দ্রের সহিত কণকলতার এবং খগেন্দ্রের সহিত অবলার পরিণয়কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। তদনুযায়ী সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হইতে লাগিল। দিনের পর দিন গত হইয়া গেল, ক্রমে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। সমস্ত নগর লোকপূর্ণ, সমস্ত নগরে আনন্দপ্রবাহ বহিতে লাগিল। এমন সময়ে এমন দিনে পাগলিনী কোথায় ?

পাগলিনী এখনও হুসেনপুরে বেড়িয়া বেড়াইতেছে। পাগলিনী অবলার ন্যায় রেজিয়াকেও বড় ভাল ব... বড় আদর করিত। আমরা গত পরিচ্ছেদে রেজিয়াকে পলায়ন করিতে দেখিয়াছিলাম, রেজিয়া এখনও সেই পলায়নাবস্থায়ই কাল কাটাইতেছেন এবং এই সময়ে পাগলিনী তাঁহার সখী ও পরিচালকের কার্য্য করিতেছে। সুতরাং যদিচ অবলার জন্য তাহার চিত্ত উৎকণ্ঠিত থাকুক, তথাপি পাগলিনী রেজিয়াকে দেখিয়া অবলা সংক্রান্ত সমস্ত কথা বিস্মৃত হইল। রেজিয়া পাগলিনীসহ দিনের বেলায় বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, রাত্রি বেলা নগরে প্রবেশ করিতেন; তাহাদের চক্ষে নিদ্রা ছিল না, তাহাদের মনে ভীতি ছিল না, তাহারা স্বচ্ছন্দমনে নির্ভীক-চিত্তে যথায় ইচ্ছা তথায় বেড়িয়া বেড়াইত।

একদা রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় তাঁহারা কাননভূমি পরিত্যাগ করিয়া নগরে প্রবেশ করিতেছিলেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন প্রাসাদসমীপে অনেকগুলি লোক দাঁড়াইয়া মণ্ডলাকারে কাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। দেখিয়া পাগ-লিনীর সমস্ত বিষয় জানিবার জন্য ঔৎসুক্য হইল। পাগলিনী রেজিয়ার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করিতে করিতে তদভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিল; কিন্তু রেজিয়া সেইস্থানে যাইতে অনিচ্ছুক হওয়ায় অগত্যা তাঁহার অঞ্চল ত্যাগ করিয়া স্বয়ং প্রবেশ করিতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা সেই জনতার আনন্দধ্বনিতে নগর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, এবং অনতিবিলম্বে তত্রমিলিত সমস্ত লোকের দর্শনার্থ একটী ছিন্নমস্তক উর্দ্ধে উথিত হইল। পাগলিনী সেই মস্তকের দিকে একবার চাহিলেন, তৎক্ষণাৎ চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল; আবার চাহিলেন, আবার পূর্ব্ববৎ চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল; আর একবার চাহিলেন, এবার আর চক্ষু নিমী-

লিত হইল না, এবার একদৃষ্টে পাগলিনী সেই মস্তক দেখিতে লাগিল; তাহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা গেল ততক্ষণ পর্য্যন্ত পাগলিনী অনিমিষনয়নে সেই মস্তকের দিকে চাহিয়া রহিল। দূর হইতে নাজিমদ্দি দেখিতে পাইল পাগলিনী সেই মস্তকের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া রহিয়াছে; দেখিবামাত্র তিনি সমবেত লোকের নিকট উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "ঐ হতভাগা বিশ্বাসঘাতকের মস্তক পাগলিনীর হস্তে অর্পণ কর, পাগলিনী উহা লইয়া খেলা করিবে।" অবিলম্বে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল। পাগলিনী মস্তক পাইয়া আনন্দিত হইল এবং সেই মস্তক একবার মস্তকে রক্ষা করিতে লাগিল, একবার বক্ষে ধারণ করিতে লাগিল, একবার অনিমিষ নয়নে সেই মস্তকপানে দেখিতে দেখিতে হাসিতে লাগিল, হি !—হি !!—হি!!!

ক্রমে সেই স্থান লোকশূন্য হইলে, নাজিমদ্দি একাকী প্রাসাদোপরি বসিয়া সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে কত কিছু চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণ নরকযন্ত্রণার ভীষণত্ব অনুভব করিতে লাগিল। আজ তিনি একাকী সেই বিশাল পুরীতে অবস্থান করিয়া চন্দ্রমাপানে তাকাইতে লাগিলেন এবং ক্ষণে ক্ষণে এক একটী দীর্ঘনিশ্বাসসহ মৃদুস্বরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন "রে—র্জি—য়া !!!"

অনতিদূরে পাগলিনী দুর্ব্বাশয্যায় উপবেশন করিয়া সেই মস্তক লইয়া খেলিতেছিল, গাইতেছিল, হাসিতেছিল হি !—হি !!—হি !!! নাজিমদ্দির দৃষ্টি সেই দিকে ধাবিত হইল; দেখিল আর একটী স্ত্রীমূর্ত্তি পাগলিনীপানে তাকাইয়া অশ্রুমোচন করিতেছে। শশিকরে তাহার শরীর উজ্জ্বল আভায় প্রকাশ পাইতেছিল; নাজিমদ্দি দেখিয়াই তাহাকে চিনিলেন এবং অনতিবিলম্বে

সেই স্থান ত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। রেজিয়া পাগলিনীর ক্রোড়ে মস্তক দেখিয়া কাঁদিতেছিল; নাজিমদ্দি সহসা তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে সাশ্রুনয়নে কাতরস্বরে বলিলেন "ক্ষমা কর।" রেজিয়া চাহিয়া দেখিলেন নাজিমদ্দি সম্মুখে উপস্থিত! অমনি এক পা দুই পা করিয়া পিছনে হঠিতে লাগিলেন, নাজিমদ্দিও এক পা দুই পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রেজিয়ার অন্তর কাঁপিতে লাগিল, মন অবসন্ন হইল, তিনি আর চলিতে পারিলেন না, তাঁহার চরণদ্বয় তাঁহার ভার বহনে সর্ব্বথা অসমর্থ হইল; তিনি হঠাৎ পড়িতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা নাজিমদ্দি তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। বহুকাল পর নাজিমদ্দি রেজিয়ার স্পর্শসুখ অনুভব করিবেন মনে মনে আশা করিতেছিলেন, তাঁহার সেই আশা সফল হইল। তিনি রেজিয়াকে ক্রোড়ে লইয়া, সেই চন্দ্রালোকে বসিয়া মৃদুস্বরে সাশ্রুনয়নে ডাকিলেন "রেজিয়া!" রেজিয়া কোন উত্তর করিলেন না। আবার ডাকিলেন, এবারও কোন উত্তর পাইলেন না; পুনরপি সেইরূপ মৃদুস্বরে ডাকিলেন 'রেজিয়া!' পূর্ব্ববৎ এবারও রেজিয়া নিঃশব্দে রহিল।

নির্ব্বোধ! পাষণ্ড! এখনও তুমি উত্তর প্রাপ্তির আশা করিতেছ? এখনও তুমি রেজিয়ার সহবাস সুখে পুনরায় সুখী হইবার কল্পনা করিতেছ? চাহিয়া দেখ, রেজিয়া নাই; তাহার দেহ মাত্র তোমার ক্রোড়ে রহিয়াছে, জীবন এজন্মতরে তোমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে।

নাজিমদ্দি রেজিয়ার শব ক্রোড়ে লইয়া সেই চন্দ্রালোকে বসিয়া একবার চন্দ্রমাপানে তাকাইতে লাগিলেন, একবার অনতিদূরস্থ বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালস্থ আঁধার পানে তাকাইতে লাগিলেন। পাগলিনী মস্তক লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তৎসমীপে

উপস্থিত হইয়া একবার খেলিতে লাগিল, গাইতে লাগিল হাসিতে লাগিল, "হি !—হি !!—হি !!!"

সম্পূর্ণ।

উপসংহার।

খগেন্দ্র ও হেমচন্দ্রের বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বেই বিধুভুষণ নিরুদ্দেশ হন্। মাণিকলাল যখন সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার কোন সংবাদ পাইলেন না, তখন নিতান্ত উদ্বিগ্ন-চিত্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার এ উদ্বিগ্নতা অন্য কেহ দেখিতে পাইল না। হেমচন্দ্র, শশিভুষণ, অবলা সকলেই তাঁহার জন্য চিন্তিত ছিলেন, মাণিকলাল তাঁহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিতেন যে অবিলম্বে বিধুভুষণ ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু বিধুভুষণ ফিরিলেন না, ক্রমে বিবাহ দিন উপস্থিত হইল, তথাপি বিধুভুষণ ফিরিলেন না। তাঁহার অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে যে সকল লোক প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারাও কোন সংবাদ আনিতে পারিল না। বিধু-ভুষণের অনুপস্থিতির দরুণ বিবাহ স্থগিত করা শশিভুষণ যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না, সুতরাং নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিবাহ কার্য্য সমাধা হইয়া গেল।

শশিভুষণ সংসারে বীতস্পৃহ ছিলেন। তিনি যে কারণ বশতঃ কণকপুর আসিয়াছিলেন, তাহার অভীপ্সিত ফললাভ হইয়াছে। অবলাকে তিনি ছোটবেলা হইতে অতি কষ্টে লালন পালন করিয়াছিলেন, তাহাকে আজ সৎপাত্রস্থা দেখিয়া তাঁহার নয়ন যুগলের চরিতার্থতা লাভ হইল। তিনি হেমচন্দ্র ও অবলার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুনরায় সেই অঘোর অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। তথায় পাগলিনীর সহিত তাঁহার একবারমাত্র সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এবং সেই সময় তিনি পাগলিনীর হস্তে বিধুভুষণের ছিন্ন মস্তক দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই মস্তক দর্শনে তাঁহার

অন্তরাত্মা দগ্ধ হইতেছিল। কিন্তু তিনি জ্ঞানবারিসেচনে হৃদয়ের শোকাগ্নি নির্ব্বাণ করিলেন, তাঁহার অন্তর পূর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র হইল, তিনি সেই অনাদি পুরুষ মহাদেবের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
আকাশা	আকাশ	৫	২৩
কিরতে	করিতে	৯	৪
শযিত	শায়িত	৯	১৪
কাণ্ঠখণ্ড	কাষ্ঠখণ্ড	১০	১০
পার্থিব রোগ অপেক্ষা	পার্থিব আর আর রোগ অপেক্ষা	১২	২১
ভৃত্যবর্গ	ভৃত্যবর্গ	১৮	১৯
নির্ম্মালার	নির্ম্মলার	২১	১৭
বিধিভূষণ	বিধুভূষণ	২১	২২
যুড়াইতেছে	জুড়াইতেছে	২৩	১
অর্দ্ধনিমীল	অর্দ্ধনিমীলিত	২৩	১৬
কুসুম শয়নীতে	কুসুম শয়নীয়ে	২৪	১৮
অযথার্থ	যথার্থ	২৮	১
		২৮	১
কোথাও	কিন্তু কোথাও	৩০	২
নিয়োজিন	নিয়োজিত	৩২	২১
বর্ষীযান	বর্ষীয়সী	৩৩	১৫
ফেলিয়া দিল	ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল	৩৪	১৮
অবার	আবার	৩৫	১৬
মাংসাল	মাংসল	৩৬	১৯
তজ্জন্য তুমি	তুমি	৩৮	২
হইতেছে না	করিতেছে না	৪১	১৩
ইইতে	হইতে	৪১	১৪
অবস্থিতি	অবস্থিত	৪২	২৩
জ্জলিতেছ	জ্বলিতেছে	৪৩	৪
হতাশবান	হতাশ	৪৮	২৪

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
দল দলে	দলে দলে	৪৯	৯
মুহূর্ত্তে	এ মুহূর্ত্তে	৫১	৩
আসিব	থাকিব	৫১	২৬
করি ।	করিয়া	৫২	১০
দেখাইবে	দেখাইব	৬১	১৯
দখ	দেখ	৬১	২১
ব্যাস্তে	ব্যস্তে	৬২	১০
তোমারা	তোমরা	৬২	১৬
এতক্ষণে	এতক্ষণ	৬২	২৪
অশ্বারোহনেণ	অশ্বারোহণে	৬৪	১৬
আর সে স্থানে	সে স্থানে	৬৪	১৯
সাহ্নিতে	হাসিতে	৬৪	২৪
বিশ্রাব্ধ	বিশ্রব্ধ	৬৬	২
খগেন্দ্রর	খগেন্দ্রের	৬৬	২৩
অঙ্গিকার	অঙ্গীকার	৬৭	১২
ে ই	সেই	৬৯	৫
বিস্মৃত	বিরত	৭২	১২
আমাদের	এ আমাদের	৭৭	১২
কাইক	কায়িক	৭৯	১৮
গণনা	বরণ	৮১	১৬
অহানিশি	অহর্নিশি	৮৫	১৫
সমস্ত্ত	সমস্ত	৮৭	২৩
বিশ্বাসঘাতকী	বিশ্বাসঘাতক	৯:	১৩